

অষ্টম বর্ষ দশম সংখ্যা মাঘ ১৩৭৫

প্রবন্ধ

গল্প

॥ সম্পা

শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মল শাপাধ্যায়, অরুণ রায়,
রণেন নাগ, সুনীল চক্রবর্তী, পল্লব দে শিহ চট্টোপাধ্যায় ॥

॥ সম্পাদকীয় দপ্তর ॥

৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (ফোন : ৩৪-৫০১৪)

সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক নিউ প্রিণ্টস্, ৩২।৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে নির্মলকান্তি ঘোষ কর্তৃক ১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। অফ্‌সেট কভার মুদ্রণ : ব্লকম্যান (প্রসেস)।

চতুষ্কোণ
মাঘ — ১৩৭৫
১৩৭৫ — ৭১

পদকল্পতরু-প্রণেতা
সতীশচন্দ্র রায়

জন্ম : ১লা কার্তিক, ১২৭৩
মৃত্যু : ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

ভবানীচরণ রায়

৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৮) সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে নিজ বাড়ীতে অবস্থান কালে পরলোক গমন করেন। স্বর্গীয় রায় মহাশয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক ধামগড়ের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ও তৎপরে ঢাকা কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ঢাকা কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা আসিয়া General Assembly's Institutionএ ভর্তি হন। তথা হইতে বি.এ. ও পরে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম.এ. পাশ করিবার পর কিছুদিন তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের কাজ করেন। পড়াশুনা ও গবেষণার পক্ষে ঐ চাকুরী অনুকূল না হওয়ায়, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ও প্রাচীন সাহিত্যের বিশেষরূপ আলোচনা করিতে থাকেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের সঙ্গে প্রথম হন (সাহিত্য) পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে খ্যাতনামা অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ-বন্ধু কর্মবীর স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ উকিল মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম.এ. পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সোনামণি বৃত্তি লাভ করেন।

কর্মজীবনের অবসানে প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ বাড়ীতে অবস্থান

করিয়া তিনি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-চর্চা ও সাহিত্য-সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি ৪০ বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার ন্যায় এরূপ দীর্ঘকাল একনিষ্ঠার সহিত একটি বিষয়ের আলোচনায় রত থাকার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "পদকল্পতরু" তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। পদাবলী-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্যে তাঁহার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য যে বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে, তাহা রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সুধীবর্গ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণব-পদাবলী বিষয়ক তাঁহার বহু মৌলিক-গবেষণাপূর্ণ, সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা এবং বাঙ্গালার অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্বে "অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী" নাম দিয়া সুবিস্তৃত ভূমিকা ও শব্দ-সূচী সহ একখানি উৎকৃষ্ট পদাবলী-সংগ্রহ তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থখানি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বি.এ. শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পূর্বে তিনি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মহাকবি ভবানন্দের "হরিবংশ" নামক কাব্য সম্পাদন করিবার জন্য নিযুক্ত হন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়া তিনি "ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনী" পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে মুন্সীগঞ্জ-সাহিত্য-সম্মিলনে ঐ বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পরে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় "পূর্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের-হরিবংশ" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিজের সংগৃহীত প্রাচীন ও প্রামাণিক পুথি ছাড়া ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকশালা হইতে হরিবংশের আরও কয়েকখানা প্রাচীন ও প্রামাণিক হস্তলিখিত পুথি তিনি প্রাপ্ত হন। এই তিন-চারিখানা পুথির পাঠ ও রূপান্তর মিলাইয়া হরিবংশের text বা মূল নিরূপণ করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত-করণে তিনি তিন চারি মাস কাল অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। "হরিবংশ" কলিকাতার 'প্রবাসী' প্রেসে মুদ্রিত হয় (১৩৩৮)।

শেষ-জীবনে পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দী-সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। হিন্দী-সাহিত্যের অনুশীলন

সম্পর্কে হিন্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক যুক্তপ্রদেশবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্মা মহোদয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। পণ্ডিতজী হিন্দীর তো কথাই নাই, সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় অগাধ পণ্ডিত। পণ্ডিতজীর সহায়তায় তিনি সুরদাস, তুলসীদাস, বিহারীলাল প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবিদিগের কাব্য বিশেষ মনযোগের সহিত পুনরায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে উর্দুরও আলোচনা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে অগাধ বুৎপত্তি ছিল বলিয়া অতি অল্পদিনের চেষ্টাতেই তিনি হিন্দীতে মৌলিক গবেষণাপুর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের মুখপত্র "সম্মেলন-পত্রিকা," লক্ষৌ হইতে প্রকাশিত "সুধা," এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত ' মনোরমা," বিহার হইতে প্রকাশিত "বালক," মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত "লেখমালা", মধ্যভারতের ইন্দোর হইতে প্রকাশিত "বীণা," এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "বিশাল ভারত" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার লিখিত হিন্দী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ৪।৫ বৎসর পূর্বে "সুধার" সাহিত্যাঙ্কে "বঁগলা-সাহিত্য কে ক্রম-বিকাস কা দিগ্‌দর্শন" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ গবেষণাপুর্ণ প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। সম্মেলন-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "অলঙ্কার ঔর কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত "কমলা" নামক মাসিক পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধে তিনি "মহাকবি সুরদাসের পদাবলী"র বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। (কমলার তৃতীয় বর্ষের শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, ফাল্গুন এবং চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইহা ছাড়া ১৩৩২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত "হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঈ" নামক সুবিস্তৃত প্রবন্ধে তিনি কবি বিহারীলালের সতসঈ-কাব্য ও পণ্ডিত-শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্মা মহোদয়-কর্তৃক সম্পাদিত উক্ত কাব্যের প্রসিদ্ধ-সংস্করণের বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের একজন স্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর পুর্বে ভরতপুরে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে যোগদান করিয়া "বিদ্যাপতি কে উপর হিন্দী-সংসার কা অনাদর ঔর উস্ কা সংশোধন" শীর্ষক একটি মৌলিক গবেষণা ও বিচার-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধটি হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন

"বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা" এই পরিবর্তিত নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিলাতের Chaucer Society, Shakespeare Society, Browning Society প্রভৃতির ন্যায় "বিদ্যাপতী-সঞ্জীবনী-সমিতি" নামক একটি সমিতি গঠন করিবার ইচ্ছা তাঁহার অনেকদিন হইতেই ছিল এবং ঐরূপ একটি সমিতি গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদ্যাপতির একটি বিশুদ্ধ, প্রামাণিক, সটীক সংস্করণের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কেবল একজনের চেষ্টায় যে ঐরূপ মহৎ কায কখনও সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তিনি সেকথা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি" গঠন করিয়া বিদ্যাপতির একটি বিশুদ্ধ প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবার তাঁহার সাতিশয় আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার "বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা" নামক পুস্তিকা, মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত "লেখমালা"র বিদ্যাপতি-অঙ্কে প্রকাশিত "বিদ্যাপতি কে বিষয় মে হমারা নম্র নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "বিশাল ভারত" নামক সুবিখ্যাত হিন্দী মাসিক পত্রিকার ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি" নামক প্রবন্ধ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত "পঞ্চপুষ্প" নামক মাসিক পত্রের ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত "বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রমাণিক সংস্করণ "শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এবং শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "সোনার গৌরাঙ্গ" নামক মাসিক পত্রে ৫।৬ বৎসর ধরিয়া প্রতি-মাসেই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত তাঁহার "বিদ্যাপতি-মীমাংসা," "বিদ্যাপতি-বিচার" ও বিদ্যাপতি-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতির" কার্য-প্রণালীর সূত্রপাত করিয়া তাঁহার পরিবর্তিগণের কার্যকে অনেক পরিমাণে অনায়াসসাধ্য করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত, পরিষৎ পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক এবং "পদকল্পতরু"র সম্পাদক

হিসাবে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "পদকল্পতরু" গ্রন্থ সম্পাদন কার্যে তিনি যে কিরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা "পদকল্পতরু"র পাঠক-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এ বিষয়ে মাত্র ২।১টি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। বৈষ্ণবপদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্য প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধান তিনি সর্বদাই করিতেন। "পদকল্পতরু"-সম্পাদনের সময় পরিষদের পুথিশালা হইতে যে সমস্ত প্রাচীন প্রামাণিক পুথি পাইয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত তিনি নিজেও কয়েকখানা অতি মূল্যবান্ প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রাচীন পুথির মধ্যে নিমানন্দ দাস সঙ্কলিত "পদ-রস-সার" নামক সুপ্রাচীন পুথিখানা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঐ পুথিখানা প্রাপ্তির ইতিহাস এবং সঙ্কলয়িতা ও গ্রন্থের পরিচয় দিয়া "নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পাঠ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়। "পদ-রস-সার" পুথিখানা অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার কাজ শেষ করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে, এই শর্তে পুথির মালিকের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন। "পদকল্পতরু"-সম্পাদন কার্যে উক্ত পুথিখানা প্রতিপদেই তাঁহার প্রয়োজন হইবে জানিয়া তিনি একখানা মজবুত রকমের বাঁধান খাতায় দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সমস্ত পুথিখানা তাঁহার মুক্তার ন্যায় সুদৃশ্য হস্তাক্ষরে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই "পদ-রস-সারে"র ঐ মূল পুথিখানা একজন ধনীব্যক্তির গৃহ হইতে অপহৃত এবং সম্ভবত চিরদিনের জন্য লুপ্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার লিখিত খাতাখানাই বোধ হয়, বর্তমানে "পদ-রস-সারে"র একমাত্র প্রামাণিক হস্তলিখিত পুথি। উহা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার লাইব্রেরীর অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকের সহিত যথাসময়ে ঐ খাতাখানিও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে অর্পিত হইবে। "পদকল্পতরু"-সম্পাদন কার্যে অত্যধিক পরিশ্রম করায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং তিনি দুরারোগ্য বহু-মূত্ররোগে আক্রান্ত হন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় এমন কি তাঁহার জীবন-সংশয়ের সম্ভাবনা পর্যন্ত ঘটিয়াছিল।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধান, বহু প্রামাণিক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির পাঠ মিলাইয়া পদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়, প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদের

লুপ্ত ও বিনষ্টপ্রায় পদের পুনরুদ্ধার ও প্রকাশ এবং বহু অজ্ঞাতনামা ও অজ্ঞাত-পূর্ব পদকর্তাদের পদাবলীর আবিষ্কার প্রভৃতি কার্যে তিনি যে কিরূপ অধ্যবসায়, গবেষণা, নৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্য সহকারে করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-রসিক মাত্রেই অবগত আছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া পদাবলী সাহিত্য আলোচনার ফল তাঁহার সম্পাদিত পদকল্পতরুর বিরাট সংস্করণ। তবে দুঃখের বিষয়, তিনি ইহাকে পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের মুদ্রণকার্য শেষ হইলে "পরিবর্তন ও পরিবধন" শীর্ষক একটি অধ্যায় গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত করিয়া মুদ্রাকর-প্রমাদের সংশোধন ও কোন কোন প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের সম্বন্ধে নূতন যেসব আলোচনা তাঁহার ভূমিকাটি লিখিত হইবার পর প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল। আকস্মিক মৃত্যুর কারণে, তিনি যে এই সঙ্কল্পটি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাতে বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনার যে কিরূপ গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। শব্দ-সূচীটি এবং পূর্বোক্ত "পরিবর্তন ও পরিবর্ধন" শীর্ষক অধ্যায়টির মুদ্রণ শেষ হইলেই গ্রন্থের সমাপ্তি হইত, এবং তিনি আর অল্প কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলেই তাঁহার জীবনের এই মহৎ কার্যের সুসমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারিতেন। পরিশিষ্ট ৬ষ্ঠ খণ্ডে তাঁহার সংগৃহীত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তাদের বহু নবাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত পদাবলী এবং প্রায় ৩০ জন অজ্ঞাতপূর্ব এবং কয়েকজন অজ্ঞাতনামা পদকর্তার বহু নবাবিষ্কৃত পদাবলী প্রকাশিত করিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সর্বসমেত এই পরিশিষ্ট-পদাবলীর সংখ্যা অনুমান এক হাজারের কিছু অধিক হইবে। এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পরিষৎ কর্তৃক পদকল্পতরুর এই সুবৃহৎ-প্রমাণিক সংস্করণের সম্পাদক নিযুক্ত হইবার বহু পূর্বে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতার ভারতীয় গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি হইতে প্রাচীন পুথি দৃষ্টে, তিনি পদকল্পতরুর একটি ভাল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিষদের সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পূর্বে উহা পদকল্পতরুর অন্যতম উৎকৃষ্ট সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

পদকল্পতরু-গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইলে প্রাচীন পুথি দৃষ্টে চৈতন্যচরিতামৃতের একটি বিশুদ্ধ প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবারও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি প্রায় ৫।৬ বৎসর উক্ত সংস্করণের জন্য উপাদান সংগ্রহে

ব্যস্ত ছিলেন। গোবিন্দদাস প্রভৃতি ২।৪ জন প্রসিদ্ধ পদকর্তার ভাল সংস্করণ প্রকাশ করিবারও আগ্রহ তাঁহার ছিল।

তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্বে পরিষদের এক অধিবেশনে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। পরিষদের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার ঐরূপ সুযোগ পাইয়া ধন্যবাদ সহকারে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। পরিষদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি আজীবন সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। কাব্য ও অলঙ্কারের প্রতিই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। অলঙ্কারে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্র তিনি সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং শেষজীবনে গীতা ও উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থরাজি অত্যন্ত যত্ন সহকারে সর্বদাই অধ্যয়ন করিতেন। "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত ঋষি-কল্প দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রবন্ধাদি তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত মহাত্মা লোকমান্য তিলকের "গীতারহস্য" নামক অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন শেষজীবনে তাঁহার অতিপ্রিয় পাঠ্য ছিল। ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে তিনি Herbert Spencerএর প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। Psychology বা মনস্তত্ত্ব ও Psycho-Analysis বা মনোবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ক Freud প্রমুখ প্রতীচ্য লেখকগণের পুস্তকাদি তিনি যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় একজন সুকবি ছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃতে সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত অনেক সুন্দর শ্লোক তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু-উপলক্ষে তিনি "দেশবন্ধু প্রশস্তিঃ" এই নামে একটি অতি সুন্দর শ্লোক লিখিয়া হিন্দী পদ্যানুবাদসহ তাহা মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যৌবনে কলেজ পরিত্যাগের পরে তিনি মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের একটি উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করেন। উহা অনেকদিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। পরে তিনি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও ভানুদত্তের সু-প্রসিদ্ধ "রস-মঞ্জরী" নামক কাব্যদ্বয়ের সুললিত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে তাঁহার "গীতগোবিন্দ" ও

"রস-মঞ্জরী"-র পদ্যানুবাদ অতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।' Goethe ও Shelleyর কয়েকটি গীতি-কবিতা ও Miltonএর "On his Blindness নামক প্রসিদ্ধ সনেটের তিনি পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন ; সেগুলি প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত স্ব-রচিত "সরলা" নাম্নী একটি অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃত টীকা সহিত ময়ূরভট্ট-রচিত প্রসিদ্ধ "সূর্য-শতক" কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ তিনি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নানা কারণে উক্ত গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য ৭।৮ ফর্মার অধিক অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার সম্পাদিত আরও একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তকও পাণ্ডুলিপির আকারেই রহিয়াছে। মৃত্যুর অল্প কয়েকবৎসর পূর্বে তিনি ঢাকা-মিউজিয়ামের শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার নিজের সংগৃহীত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা হইতে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি মিলাইয়া "গোপালচরিত" নামক একখানা সংস্কৃত-কাব্য একটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকা-সহ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। "গোপালচরিত" রচয়িতা যে কে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কোন কোন প্রাচীন পুথিতে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেবকেই গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিনি একজন সুনিপুণ ভাষাবিদ্ ছিলেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিল, উর্দু এবং অল্প-বিস্তর ফার্সী, গুজরাটী ও ওড়িয়া ভাষা তিনি জানিতেন। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গালা-শব্দকোষ" এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের" সমালোচনায় তিনি তাঁহার ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ["বাঙ্গালা শব্দকোষ (সমালোচনা)" ১৩২৩ বঙ্গাব্দের এবং "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" ১৩২৫ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।] শব্দকোষের সমালোচনা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। তরুণ ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং ডক্টর মৌলভী মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু তাঁহার "Origin and Development of the Bengali Language" নামক অমূল্য গ্রন্থের দুই খণ্ড তাঁহাকে সাদরে উপহার দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এবং অবকাশ পাইলেই উক্ত গ্রন্থের বিশদরূপে আলোচনা করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিবেন, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে ঐতিহাসিক গবেষণা এবং প্রত্নতত্ত্বের দিকে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্বে "রত্নাবলী-রচয়িতা শ্রীহর্ষ" নামক একটি সুদীর্ঘ মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া Asiatic Societyর পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে মাসিক পত্রাদিতে কোন প্রবন্ধ না লিখিলেও, এ সম্বন্ধে যে তিনি অনেক পড়াশুনা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম-মন্দির বিষয়ক তাঁহার স্বহস্ত লিখিত নোটে ভরা কয়েকখানা পুরাতন খাতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর-শিল্পের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদিগের চিত্রাবলী এবং গ্রীক্ ও রোমান্ ভাস্কর-শিল্প বিষয়ক সচিত্র বহু গ্রন্থ তিনি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইটালী-দেশীয় স্থপতি ও চিত্রকর Giorgio Vasari প্রণীত Lives of the most excellent Painters, Architects and Sculptors নামক বিখ্যাত বই তিনি কলিকাতার Imperial Library-তে বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর Hogarth-এর সামাজিক বিদ্রূপমূলক Prints বা চিত্রাবলীরও তিনি Imperial Libraryতে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করিয়াছিলেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং অবনীন্দ্র-নাথ লিখিত কলাবিষয়ক প্রবন্ধাদি তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগের ফলে লাহোর গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের সুযোগ্য সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং পত্রব্যবহার হয়। শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ের অর্থাৎ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বের সাহিত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন-সমূহের বিশদরূপে পর্যালোচনা করিয়া তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি অপূর্ব মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি বহু-

দিন পূর্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনী' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। Chaucer হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর Hardy, H. G. Wells, Bernard Shaw, Galsworthy প্রমুখ অতি আধুনিক লেখকদিগের রচনাও তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদিতে তিনি তাঁহার ইংরেজী সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অনুবাদের সাহায্যে গ্রীক, ল্যাটীন্, ফরাসী, ইটালিয়ান, জার্মান এবং রাসিয়ান প্রভৃতি সাহিত্যের লেখকগণের রচনা তিনি অত্যন্ত মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফরাসী কথা-সাহিত্যের তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। George Sand, Balzac, Gautier, Dautet, Flaubert, Maupassant, Hugo, Zola, Anatole France প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ফরাসী কথা-সাহিত্যিকদের রচনা তিনি আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছেন। George Sandএর Consuelo তাঁহার অতি প্রিয় বই ছিল। কলিকাতার Imperial Library-তে বসিয়া তিনি Balzacএর উপন্যাস-সমূহের সুপ্রসিদ্ধ 'Comedie Humaine' নামক বিরাট-সংগ্রহ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। Montaigne এবং Sainte-Beauveএর রচনাবলী তাঁহার অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। ফরাসী-সাহিত্যের উপর তাঁহার এত বেশী অনুরাগ ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্বে তিনি ফরাসী ভাষা শিখিবেন, এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার জন্য প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্য বই এবং একখানা ভাল ফরাসী-ইংরেজী অভিধান কিনিয়া পাঠাইতে তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন। তিনি Maupassant-রচিত কয়েকটি ছোট গল্পের অনুবাদ করিয়া এক বন্ধুর অনুরোধে মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। জার্মান কবি গেটের (Goethe) তিনি অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন।

Eckermannএর 'Conversation witn Goethe' তাঁহার অতি প্রিয় বই ছিল। আলোকসামান্য প্রতিভা, লোকোত্তর কবিত্ব এবং বহুদর্শিতা প্রভৃতি বিষয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তিনি Goethe-এর সহিত তুলনা করিতে ভালবাসিতেন।

Goethe ও রবীন্দ্রনাথের এইরূপ তুলনা-মূলক সমালোচনা, আমাদের দেশে কেহই করেন নাই বলিয়া তিনি প্রায়ই দুঃখ করিতেন এবং পদাবলী-সাহিত্য-প্রকাশ কার্য হইতে অবসর পাইলেই রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

অবসর পাইলেই আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য, বিশেষতঃ বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তরুণ লেখক ও লেখিকাদের রচনা তিনি আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। লেখিকাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী এবং প্রসিদ্ধ 'প্রবাসী'পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের কন্যাদ্বয় শ্রীযুক্তা সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাসগুলির তিনি প্রশংসা করিতেন।

রচনা-রীতি প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি স্বীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার চরিত্র ও রচনা-রীতির উপর বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাব অতি সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ছাড়া জ্যোতিষ ও সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি প্রায় সমস্ত জীবনই, অবসর সময়ে ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সুদীর্ঘ কাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনার ফলে, তিনি যে সকল মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি অবসর পাইলে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবেন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল। তাঁহাকে শঙ্করাচার্য, নেপোলিয়ান, কাইজার, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কোষ্ঠীবিচার করিতে দেখিয়াছি।

সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও বুৎপত্তি ছিল। তিনি একজন উচ্চদরের মৃদঙ্গ ও তবলা বাদক ছিলেন।

কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক মুরারিবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট মৃদঙ্গ শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহা ছাড়া কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের চর্চাও তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক সংগঠিত এক সঙ্গীত সম্মিলনীতে সভ্য হইয়া তিনি কিছুদিন নিয়মিতরূপে 'সঙ্গত' অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে 'মৃদঙ্গ-মঞ্জরী'.

'সেতার শিক্ষা' ও সঙ্গীত বিষয়ক বহু বই দেখিয়াছি। তাঁহার নিজ হাতে লেখা মৃদঙ্গের 'বোল'-ভরা বহু পুরাতন নোটবই তাঁহার কাগজ-পত্রের মধ্যে দেখিয়াছি। তাঁহার সমসাময়িক বহু শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকের কথাও আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। সাহিত্যামোদী ও সঙ্গীতজ্ঞ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' নামক সুবৃহৎ সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ (Encyclopædia) তিনি আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে নোট করিয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইংরেজী কবিতার আলোচনা করিতে হইলে যেরূপ অল্প-বিস্তর ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান আবশ্যক, সেইরূপ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলেও, ভাল রকম ছন্দঃশাস্ত্রে জ্ঞান, একরকম অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীতে অসাধারণ বুৎপত্তি হেতু ছন্দঃশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। পদাবলী ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে তিনি সর্বদাই তাঁহার গভীর ছন্দজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার এইরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার সহিত সততা, বিনয় ও সহৃদয়তা প্রভৃতি বিবিধ গুণরাজির সমাবেশের ফলে, এক অপূর্ব মণি-কাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে বঙ্কিমের অনুকরণে কাব্য-উপন্যাস লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিনের চেষ্টার পরেই তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে ঐরূপ শ্রেষ্ঠ মৌলিক সাহিত্য রচনার উপযুক্ত প্রতিভা তাঁহার নাই এবং তদবধি তিনি কেবল পদ্যানুবাদ ও প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন ও বিচার-কার্যেই ব্যাপৃত রহেন। পদ্যানুবাদে তাঁহার কৃতিত্ব তাঁহার 'মেঘদূত', 'গীত-গোবিন্দ' ও "রস-মঞ্জরী'র পাঠক মাত্রেই সম্যকরূপে অবগত আছেন।

তাঁহার পদাবলী সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে তিনি সর্বত্রই তাঁহার পূর্ববর্তিগণের যিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে, কাহারও সহিত কোনও মতভেদ উল্লেখ করিতে বা কাহারও কোন ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিতে যাইয়া তিনি কখনও তাঁহার স্বভাব-সুলভ বিনয় ও সৌজন্য পরিত্যাগ করেন নাই। "অকরণাৎ মন্দকরণমপি শ্রেয়ঃ"— তিনি সর্বদাই এই মহৎ নীতির অনুসরণ করিয়া

তাঁহার পূর্বে যাঁহারা পদাবলী-সাহিত্যের সম্পাদন ও কিছুমাত্রও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সর্বত্রই অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাদিগের প্রাপ্য ন্যায্য প্রশংসা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করিয়াছেন। এস্থলে সত্য ও সম্পূর্ণতার অনুরোধে, ইহাও বলা আবশ্যক মনে করি যে, তিনি কেবল তাঁহার পূর্ববর্তিগণের সশ্রদ্ধ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই, তাঁহার সমসাময়িক বহু প্রবীণ ও তরুণ লেখকদিগের গবেষণারও তিনি সর্বত্রই শ্রদ্ধা ও সৌজন্য সহকারে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও কেবল নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য কোনও বিশেষ একটি মতের সমর্থন করেন নাই,— সর্বত্রই তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা প্রমাণ ও সুযুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন মাত্র। ভ্রম-প্রমাদ হওয়া মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। নিজের সিদ্ধান্তটিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চোখ-কান বুজিয়া বসিয়া থাকা অথবা বিদ্রূপ করিয়া অপরের সিদ্ধান্ত বা মতকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টার ন্যায় মনের সংকীর্ণতা তাঁহার ছিল না।

সমালোচনা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে তিনি বঙ্কিম-প্রদর্শিত আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের উত্তররামচরিতের এবং স্বর্গীয় ভূদেববাবুর রত্নাবলীর সমালোচনা, তিনি তাঁহার সমালোচনার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন। ইংরেজী সমালোচনাত্মক সাহিত্যের সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল, এবং তিনি তাঁহার লেখার বহু স্থলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক Mathew Arnold-এর মতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি সুরসিক ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাকে অনেক পত্রেই "রসিকবরেষু" এইরূপ পাঠ লিখিতেন। নীরস ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকেও অত্যন্ত সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

আমরা অতঃপর তাঁহার চরিত্র ও ধর্মমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তাঁহার ন্যায় বিবিধ সদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রায় সচরাচর দৃষ্ট হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল— তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের

লেশমাত্রও ছিল না। অশেষ জ্ঞানী হইয়াও তিনি বিনয়ের প্রতিমূর্তি ছিলেন। জীবনে কখনও তাঁহাকে ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি রিপুর বশবর্তী হইতে দেখি নাই। তিনি এরূপ ধীর প্রশান্ত প্রকৃতির ছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্রই মনে শ্রদ্ধার উদয় না হইয়া পারিত না। দয়া, ক্ষমা ও সহনশীলতা তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। তাঁহার চরিত্রে এরূপ একটি স্বাভাবিক মাধুর্যগুণ ছিল যে, সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ব্যক্তিকেও তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। বহু খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে 'কাব্যবিনোদ' 'সাহিত্যরত্ন' 'সাহিত্য-শাস্ত্রী' 'কবিভূষণ' প্রভৃতি উপাধি দেওয়ার বহু প্রস্তাব তিনি বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার নিকট লিখিত এক পত্রে তাঁহাকে 'পদাবলী-মথক' বা ঐরূপ অন্য কোনও উপাধি গ্রহণ করিতে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্র রায় রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাদি

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" — ভারতীয়-গ্রন্থ প্রচার সমিতি, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

২। "মেঘদূত"—সুললিত পদ্যানুবাদ।

৩। "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ" (সচিত্র)—সুদীর্ঘ ভূমিকা, সংস্কৃত মূল, পূজারি গোস্বামীর টীকা, সুললিত পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

৪। 'রস-মঞ্জরী'—বিস্তৃত ভূমিকা, সূচী ও ব্যাখ্যা সম্বলিত সুললিত পদ্যানুবাদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৫। 'সূর্য্যশতক'—ভূমিকা, সংস্কৃত মূল, স্ব-রচিত 'সরলা' নাম্নী টীকা, পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা-সম্বলিত (অসম্পূর্ণ)।

৬। 'অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী'—সুবিস্তৃত ভূমিকা, বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, দুরূহ স্থলে পাদ-টীকা ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচী সহ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পদ-কর্তার৹ও ২৮ জন

অজ্ঞাত-পূর্ব পদ-কর্তার ৬০০ শতের অধিক উৎকৃষ্ট, অপ্রকাশিত ও নবাবিষ্কৃত পদাবলীর সংগ্রহ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

৭। বিদ্যাপতি বিচার। নিবন্ধ। সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শীত, ১৩৬৭। ১০৭-২৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় এবং পরে তাহা পুস্তকাকারেও গ্রথিত হয়। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই নিবন্ধাবলী ধারাবাহিকভাবে পূর্বে শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত 'সোনার গৌরাঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র ভবানীচরণ রায় এই নিবন্ধমালা সংগ্রহ করিয়া 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশ করেন।

৮। বিদ্যাপতি-পদ্য-সংগ্রহ। প্রকাশক: হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলন, এলাহাবাদ। ইহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ পুস্তক। নাগরী লিপিতে প্রকাশিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর সম্পাদকদের ভুলগুলি ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু"—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।
১ম খণ্ড, ১৩২২ বঙ্গাব্দ; ২য় খণ্ড, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ;
৩য় খণ্ড, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ; ৪র্থ খণ্ড, ১৩৩৪ সন,
৫ম খণ্ড, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

২। ভবানন্দের 'হরিবংশ'—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৩। 'নায়িকারত্ন-মালা'—'ভক্তিপ্রভা' প্রেস, আলাটী (হুগলী) হইতে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

৪। "গোপাল-চরিতম্" (সংস্কৃত-কাব্য) সুবিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত। (অপ্রকাশিত)

প্রকাশিত প্রবন্ধাদি
(বাঙ্গালা)

১। 'রত্নাবলী-রচয়িতা শ্রীহর্ষ' — সাহিত্য, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

২। 'প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ'—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫ শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৩। 'প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃকগণ'—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, ২য় সংখ্যা ; ১৮শ ভাগ, ২য় সংখ্যা ; ২০শ ভাগ, ২য় সংখ্যা ; ১৩১৬, ১৩১৮, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৪। "লক্ষ্মণসেনের সময়ে বঙ্গের অবস্থা'—মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বের সাহিত্য ও শিল্পকলার নিদর্শনসমূহ বিশদরূপে পর্যালোচনা করিয়া তৎকালের সামাজিক অবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ, ১৪৩ পৃঃ—ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

৫। 'নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার'—(পাবনা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

৬। 'অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তৃকগণ—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৩০শে পৌষ, ৪২৯ গৌরাঙ্গাব্দ (১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

৭। 'নবাবিষ্কৃত শ্রীগৌরাঙ্গপদাবলী'—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৭ই মাঘ, ৪২৯ গৌরাঙ্গাব্দ (১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

৮। 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'—জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিচার (রাজসাহী, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলেনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

৯। 'বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-বৈচিত্র্য'—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, অগ্রহায়ণ ও মাঘ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

১০। "বাঙ্গালা শব্দকোষ"—সমালোচনা (বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের ৮ম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

১১। "অজ্ঞাত পদকর্তৃগণ"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, কার্তিক ও পৌষ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র, ও আশ্বিন (যুগ্ম-সংখ্যা), কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (যুগ্ম-সংখ্যা), ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

১২। "বৈষ্ণব-কবিতা"—সমালোচনা (বগুড়া, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের দশম-অধিবেশনে পঠিত) নারায়ণ, ১৩২৪ সন।

১৩। "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

১৪। "ভবানন্দের মহাকাব্য হরিবংশ"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ফাল্গুন ও চৈত্র (যুগ্ম-সংখ্যা) এবং তাহার পরের সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

১৫। "মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী ?"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ভারতবর্ষ, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

১৬। "বৈষ্ণব-পদাবলীর রসাস্বাদন"—[গোবিন্দদাস] (সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) প্রাচী, চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ;
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

১৭। "হিন্দী সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঈ"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

১৮। "পূর্ববঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ"—(মুন্সীগঞ্জ-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের-ষোড়শ-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত), সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

১৯। "গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ), সোনার গৌরাঙ্গ, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ; সাধনা (কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত), ১ম বর্ষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

২০। 'বিদ্যাপতি-বিচার'—[সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ]
সোনার গৌরাঙ্গ; শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, ৩য় বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। ৪র্থ বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
৫ম বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ;
৬ষ্ঠ বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, চৈত্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
৫ম বর্ষ—কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

২১। 'মহাকবি রামানন্দ রায়ের পদ'—সোনার গৌরাঙ্গ ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

২২। "মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?"
— (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বীরভূম অধিবেশনে পঠিত)
ভারতী, আষাঢ, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

২৩। 'জ্ঞানদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন' (সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
সোনার গৌরাঙ্গ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
বৈশাখ, ভাদ্র, পৌষ, মাঘ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
শ্রাবণ, ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
শ্রাবণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

২৪। "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী-সম্পাদকের নিবেদন"
[চণ্ডীদাস-সমস্যা বিষয়ক] শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় লিখিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" নামক প্রবন্ধের উত্তরে লিখিত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

২৫। "মহাকবি সুরদাসের পদাবলী"— (হিন্দী সাহিত্য বিষয়ক সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
কমলা, ৩য় বর্ষ, শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র।

২৬। "বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রমাণিক সংস্করণ"— (সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) পঞ্চপুষ্প—আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

২৭। "দ্বিজরঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি"— সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪।

২৮। 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন" সম্বন্ধে বক্তব্য—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৭॥

২৯। 'বাঙ্গলা ভাষায় অনুজ্ঞা' (শহীদুল্লাহ্) প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৫।

হিন্দী

১। "বিদ্যাপতি কে বিষয় মেঁ হমারা নম্র নিবেদন"—
মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত "লেখ-মালা' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার "বিদ্যাপতি-অঙ্কে" প্রকাশিত, লেখ-মালা, গুচ্ছ ১, পুষ্প ৪, বসন্তোৎসব, ১৯৮৪।

২। 'বিদ্যাপতি কে উপর হিন্দী সংসার কা অনাদর ঔর উস্ কা সংশোধন"—
ভরতপুর হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত এবং প্রয়াগের (হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক 'বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা'—এই পরিবর্তিত নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
৩। 'বিদ্যাপতি সঞ্জীবনী সমিতি'—বিশাল ভারত, কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯২৯।
৪। 'অলঙ্কার ঔর কবিতা'—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ), সম্মেলন-পত্রিকা, প্রয়াগ, শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, সংবৎ ১৯৮৩ বিং।
৫। 'রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দী'—মনোরমা, এলাহাবাদ।
৬। 'বংগলা সাহিত্য কে ক্রম-বিকাশকা দিগ্দর্শন'—সুধা,লক্ষ্ণৌ, সাহিত্যাঙ্ক ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।
৭। 'মহারাণী অহল্যা বাঈ ঔর রাণী ভবানী'—বীণা, ইন্দোর (মধ্যভারত), অহলাঙ্ক, ভাদ্রপদ, সংবৎ ১৯৮৭, বর্ষ ৩, অঙ্ক ১১।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের নিরলস গবেষক ও মহাপণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী দু-একটি পত্রিকায় যথাসময়ে উল্লেখিত হলেও একান্ত নিরবতার মাঝেই অতিক্রান্ত, এজন্য আমরা যারপরনাই দুঃখিত। বিলম্বে হলেও সতীশচন্দ্রের গবেষণা ও সাহিত্যকর্মের যথাযোগ্য মূল্যায়নের পথ প্রসস্ত করার জন্য আমরা বর্তমান নিবন্ধটি প্রকাশ করলাম। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থে আহূত ১৩৩৮, ৩১শে শ্রাবণ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে রায়মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ভবানীচরণ রায় একটি রচনা পাঠ করেন। বর্তমান নিবন্ধটি তারই পরিবর্তিত সংস্করণ। ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা রচনাটি সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন। গ্রন্থ-তালিকাটিও তিনি সংশোধন করে দিয়েছেন।—সঃ চ

নেদারল্যাণ্ডসে ভারত-বিদ্যাচর্চা

শিবদাস চৌধুরী

এক

পাশ্চাত্য দেশের সংগে ভারতের যোগাযোগ বহু শতাব্দীর। তার পরিচয় রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে, প্রাচীন সাহিত্য ও লোককথাতে। গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক) ভারত বিবরণ আমরা প্রায় সকলেই জানি। সপ্তদশ শতক থেকে ভারতকে নতুন ভাবে জানবার ও ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল্যায়ন করবার বাসনা ইউরোপে জেগে ওঠে। ইউরোপীয় বণিক, পরিব্রাজক ও ধর্মযাজকগণ ভারতে এসে এই দেশের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী ইউরোপীয় মনীষীদের অন্যতম হলেন উইলিয়ম জোন্স। তিনি চিরাচরিত গবেষণা পদ্ধতির পরিবর্তে ঐতিহাসিক পদ্ধতির সূচনা করেন। উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উৎসাহ ও নৈপুণ্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় যুগান্তর আনে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি ছাড়া তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি তাঁরা প্রবর্তন করেন।

ভারতীয় সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ইউরোপের বহুমুখী গবেষণার পুর্ণ পরিচয় দেওয়া একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের ভারতীয় সভ্যতার মূল্যায়নে যে অবদান রয়েছে তার একটির (অর্থাৎ হল্যাণ্ডের) গবেষণার ধারার উল্লেখ করব।

গত শতকের শেষ ভাগে ডাচ পণ্ডিতদের ভারত-বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। কার্ণ (১৮৩৩-১৯১৭) যে দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তা আজও তাঁর উত্তরসূরীরা সমুজ্জ্বল রেখেছেন। ভারত-

তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান কেন্দ্রসমূহের নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারগুলি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এদের দ্বার সকল অনুসন্ধিৎসুদের জন্য উন্মুক্ত। ফোগেল স্থাপিত কার্ণ ইন্‌ষ্টিট্যুট ও উট্রেক্টে কালাণ্ডের নামাঙ্কিত বেদকক্ষ ভারত-তত্ত্ববিদ্‌দের তীর্থস্থান। তা ছাড়া আরও গ্রন্থাগার রয়েছে। নেদারল্যাণ্ডসে প্রায় সর্বত্রই অল্প সময়ে যাতায়াত করা যায়। এ অবস্থা কাজের অনুকূল।

দুই

জোন্সের বহুপূর্ব থেকেই ইউরোপ ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। যারা ভাঁরতের কথা ইউরোপে প্রচার করেন তাদের অনুসন্ধানের মূলে ছিল ঔৎসুক্য। সেই বাণী প্রচারকদের পুরোধাতে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ওলন্দাজদের অবদান স্মরণীয়। ১৬০৯ খৃঃ কুলিকটে ডাচ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। তখন থেকেই ডাচেরা ভারতের সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সপ্তদশ অষ্টদশ শতকে বণিকদের সঙ্গে ধর্মপ্রচারকেরা এদেশে আগমন করেন; তাঁদের অনেকেই হিন্দুদের ধর্ম কর্ম, সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে লিখেছেন। আব্রাহাম রোজারিয়স নামে একজন ওলন্দাজ যাজক ও ধর্মপ্রচারক করমণ্ডল (চোলমণ্ডল) উপকূলে মাদ্রাজের নিকটে বসবাস করতেন। এদেশে তিনি সতের বৎসর (১৬৩০-৪৭) ছিলেন। খুব জনপ্রিয় হওয়ায় তিনি সহজেই স্থানীয় লোকদের আচার-ব্যবহার, সাহিত্য, পুজা পার্বণ, প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। এখানে পদ্মনাভ নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়; তাঁরই সাহায্যে সংস্কৃত গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত (১৬৫১ খৃঃ প্রকাশিত) গ্রন্থে, ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম, পুজাপার্বণ, পরকালতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের কথা রয়েছে। ব্রাহ্মণদের জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বেদের চারি শাখার কথা ইউরোপে প্রচার এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ তাঁরই কৃতিত্ব। ভর্তৃহরির বৈরাগ্য শতক ও নীতি-শতকের এবং তামিল বৈষ্ণব গাথার অনুবাদ তিনিই করেছিলেন। বার্ণাল সাহেব (১৮৯৮ সালে) হিন্দুধর্মের উপরে তাঁর বর্ণনাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[১] তাঁর উক্তিতে ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও ইউরোপে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারকদের তিনি পথিকৃৎ। তাঁর পুস্তক ইউরোপের বিভিন্ন

ভাষায় অনূদিত হয়। এই বইটি ও অন্যান্য গ্রন্থ ইউরোপের সুধী সমাজে ভারত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করে এবং ইউরোপের বাহিরেও যে প্রাচীন ও বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ রয়েছে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করে।[২]

এই দুই শতাব্দীতে ভারত সম্বন্ধে বহু তথ্য ডাচদের বিবরণী থেকে জানা যায়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত মৌলিক চিন্তা ধারা তখনও অনুসৃত হয়নি। তাঁদের অনেকেই তামিল, তেলেগু ও হিন্দুস্থানী জানতেন, কিন্তু সংস্কৃতের জ্ঞান একমাত্র কৃষকপুত্র বহু ভাষাবিদ্ যাগের (১৬৩৬-৯৪) ব্যতীত আর কারো ছিল বলে জানা যায় না। যাগের ডাচ কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। করমণ্ডল উপকূলে ছিল তাঁর কর্মস্থল। এখানে তিনি দশ বৎসর ছিলেন (১৬৭০-৮০)। সেই সময়ে তিনি সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ রামফিয়াসকে লিখিত এক পত্র থেকে। জাভার 'কবি' ভাষা যে সংস্কৃত ও তামিল শব্দে পুষ্ট তা তিনি রামফিয়াসকে লেখেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর কাগজপত্র সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তাঁর পরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে ডাচদের অনুসন্ধানস্পৃহা স্তিমিত হতে থাকে। ব্যবসা ও ধর্ম প্রচারের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই তাঁদের এদেশের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাই উইলিয়ম জোন্সের প্রবর্তিত ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে যখন ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতচর্চা আরম্ভ হয়ে গেল—হল্যাণ্ড তখনও সুপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লাইডেনে সর্বপ্রথম সংস্কৃত পড়াবার বন্দোবস্ত হয়। অধ্যাপক হামাকর সংস্কৃত পড়াতেন। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত চর্চার সূচনা করলেন; তাঁর মৃত্যুর পরে হিব্রুর অধ্যাপক রুট-গারস্(Rutgers) সংস্কৃত পড়াতেন। তাঁর এক কৃতী ছাত্র হেণ্ড্রিক কার্ণ হল্যাণ্ডে সংস্কৃতচর্চার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি যে দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছেন তা আজও সেখানে অনির্বাণ রয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে তিনি হলেন অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। লাইডেনে পাঠ শেষ করে তিনি প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ বেবারের নিকটে যান। তাঁরই পরামর্শে তিনি বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার সংকলন ও অনুবাদ কার্যে মনোনিবেশ করেন। দেশে ফিরে

কিন্তু মনের মত কাজ পেলেন না। তাঁকে কলেজে গ্রীক্ পড়াতে হত; অবসর, কাটাতেন সংস্কৃতচর্চা করে। হল্যাণ্ড তাকে গ্রহণ করবার জন্য তখনও প্রস্তুত হয় নাই। এই সময়ে তিনি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ডাচ ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ হল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন আনে। সংস্কৃতের অপূর্ব রত্নসম্ভার তাঁদের শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য উদ্রেক করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা সেখানে সংস্কৃতের একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁরা সফল হন নাই। হতাশ হয়ে কার্ণ লণ্ডনে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে কাশীর কুইন্‌স্ কলেজে* অধ্যাপকের পদ পান†। দুই বৎসর তিনি কাশীতে ছিনে। এখানে ভট্টকর্ণ নামেই তাঁর পরিচয় ছিল। একজন গুণমুগ্ধ ছাত্র তাঁর নামে একটি সংস্কৃত পদ্য রচনা করেছিলেন।

জয়তি জয়তি কর্ণঃ কৌমুদীশুভ্রবর্ণঃ।
খলভুজগসুপর্ণঃ শাস্ত্রদত্তৈক কর্ণঃ॥
জগদখিল সুবিদ্যাসিন্ধুনৌকর্ণধারঃ।
কৃতনিজগুণ সংখ্যাকর্ণ কীর্ত্তিপ্রহারঃ॥
সমাস্থাকূপারে প্রবমকৃতলিপ্সাঃ কবিগিরো
নিমজ্জন্তি ক্ষিপ্রংতব করুণয়া পশ্যসি যদা।
নিমগ্নোঽরং পারং ব্রজতি বিচিকিৎসার্ণবজলাদ্
অতঃ সেব্যোঽসি ত্বং কবিভিরথবা সংশয়গতৈঃ॥

ইতিমধ্যে হল্যাণ্ডের অনেক পরিবর্তন হয়। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ এই সময়ে সৃষ্টি করা হয়। সেই পদে কার্ণ ১৮৬৫ সালে যোগদান করেন। ৪০ বৎসর শিক্ষকতা করে বহু ছাত্রকে ভারত-বিদ্যায় দীক্ষিত করেন। পরবর্তী কালে তাঁরা সকলেই পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর জীবন-সাধনা ছিল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, অনুসন্ধান ও গ্রন্থরচনা। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাদি সতের খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তৎসম্পাদিত যোগযাত্রা, আর্যভটীয়, সানুবাদ সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের সংস্করণ, জাতকমালার অনুবাদ, জাভার কবি ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত ও নাগরকৃতাগমের

*বর্তমান বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় † ১৮৬৩

সংস্করণ। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, যাভার সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব ইত্যাদি। মৌলিক রচনার জন্য আমরা তাঁর নিকট ঋণী। আর্যভট্টীয় গ্রন্থখানি (১৮৭৪) হল্যাণ্ডে ছাপা প্রথম নাগরী অক্ষরের বই। এর পূর্বে ১৬৬৭ সালে আমাষ্টারডামে মুদ্রিত কিরচেরীর 'চায়না ইলাষ্ট্রাটা' গ্রন্থে নাগরী অক্ষরের নমুনা পাই।[৩]

তিন

কার্ণের শিষ্যদের মধ্যে জে এস স্পেয়ার (১৮৫৯-১৯১৩), উইলিয়ম কালাণ্ড (১৮৫৯-১৯৩২), সি এস উলেনব্যাক এবং জিন ফিলিপ ফোগেল (১৮৭১-১৯৫৮) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্ব ও আর্টের গবেষণার ইতিহাসের পাতাটি উজ্জ্বল করেছেন।

লাইডেনে কার্ণের উত্তরাধিকারী স্পেয়ার ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত সিন্‌টেক্‌স এবং বৌদ্ধ-ধর্মে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত অবদান-শতক, দিব্যাবদান, বুদ্ধ চরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যে এবং অনূদিত জাতক-মালাতে নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের ছাপ রয়েছে। কথাসাহিত্যও তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল। এ বিষয়ে কথাসরিৎসাগরের উপরে তাঁর গ্রন্থখানিতে (১৯০৮) মৌলিক চিন্তাধারার সাক্ষ্য রয়েছে। উট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক কালাণ্ড ছিলেন বেদজ্ঞ। তাঁর মৃত্যুর পরে শোকসভাতে কালাণ্ডের পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।[৪] এই শোকসভা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড (রিচুয়্যাল) ও ঐতিহ্যের গবেষণা কার্যে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রাচীন ভারতে পুর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ (১৮৯০), ইন্দ্রজাল বিদ্যা (১৯০০) এবং মৃত্যু ও পরলোক বিষয়ে গ্রন্থত্রয়ে তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৭ সালে তিনি বেদ-চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত বৈদিক গ্রন্থরাজির মধ্যে পাঁচখানি[৫] কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের (১৯৩১) অনুবাদকে "triumph of scholarship" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কল্পসূত্রের আপেক্ষিক কাল ও সামবেদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ফুকুসীমা বলেন—"no single scholar has ever contributed so much to the

comprehension of Samaveda literature" তাঁর কর্মময় জীবনালেখ্য ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য ডাচ রয়েল একাডেমি অফ সায়েন্সের বর্ষপঞ্জী (১৯০২—১৯০৩) দ্রষ্টব্য।[৫]

আমষ্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক উলেনব্যাক ফোনেটিক্সে (ধ্বনিতত্ত্ব) বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর উপক্রমণিকা গ্রন্থ[৬] সংস্কৃতের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত। লাইডেনে সংস্কৃত ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ফোগেলের নাম ও কাজ এদেশে অপরিচিত থাকবার কথা নয়। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের উপরে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ[৭]; ডাচ ভাষায় তিনি এর অনুবাদ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে 'ভারতীয় সাহিত্যে ও শিল্পে হংস' নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, এপিগ্রাফি ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর রচনাবলী ভারত সভ্যতার ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে প্রভূত সাহায্য করেছে। ভারততত্ত্বের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ধারাবাহিক অনুশীলন চালাবার জন্য তিনি লাইডেনে কার্ণ ইনষ্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২৫)। লাইডেনে ফোগেলের উত্তরাধিকারী হলেন কুইপার (F.B.J.K)। সংস্কৃতে মুণ্ডা শব্দ (১৯৪৮) এবং নহালী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থদ্বয় ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোজনা করেছে। ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত কুইপারের 'প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষার উপরে অনার্য ভাষার প্রভাব' বিষয়ে গবেষণা উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ধর্ম বিষয়েও তিনি আলোকসম্পাত করেছেন। বৈদিক ধর্মের বিকাশে মুণ্ডাদের দান ও প্রাগৈতিহাসিক ইন্দো-ইরাণী ধর্মের স্বরূপের উপরে তাঁর আলোচনা নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। যে কয়জন মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভাষাতে গভীর দখল রয়েছে তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

উলেনব্যাকের পরে আমষ্টারডামের সংস্কৃতের অধ্যাপক হ'লেন যথাক্রমে বি-ফডেগণ ও এ. শার্পে। ফডেগণ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। শঙ্করের গীতাভাষ্য ও কুন্দকুন্দের প্রবচনসার তিনি সম্পাদন করেছেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও ভারতীয় সংগীতের উপরে তাঁর কাজে মৌলিকতা রয়েছে। ফডেগণের পূর্বে ক্রনিং ব্যতীত আর কেহ ভারতীয় দর্শনের উপরে কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করেন নি। তিনি জার্মান পণ্ডিত ডয়সনের পূর্বে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের আংশিক অনুবাদ করেছেন (১৮৭১)। সেই

দীপশিখা অনির্বাণ রেখেছেন অধ্যাপক বুইতানেন। রামানুজের গীতাভাষ্যের উপরে তাঁর কাজ রয়েছে। রামানুজের বেদার্থসংগ্রহ তিনি সম্পাদন ও অনুবাদ করেছেন। শার্পে ভারতীয় দর্শন, ব্যাকরণ এবং কাব্য চর্চা করেন ; বাণের কাদম্বরীর উপরে তাঁর গ্রন্থ রয়েছে। কালিদাসের গ্রন্থাবলীর একখানি কোষগ্রন্থ রচনাকার্যে তাঁহার ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে।

চার

আমষ্টারডামের অন্যান্য ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে ভারত-যাভা পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ কুন্‌স্ট যাভার সংগীত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। ভ্রিসি (Vreese) কাশ্মীরের নীলমত পুরাণের একটি সংস্করণ সম্পাদন করেছেন ; পালি ও অপভ্রংশ সাহিত্য তিনি চর্চা করেন। ইদানীংকালে ভারতের বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে পরিচয় লাভের জন্য তিনি ভারতবর্ষ ঘুরে গিয়েছেন। ভারত ও বৃহত্তর ভারতে পুরাতত্ত্ব ও আর্ট-ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমতি লুহিএনের গবেষণা প্রসূত রচনাবলীর মধ্যে সিথিয়ান যুগের ইতিহাস খানি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

উট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৯৩২) খোণ্ডা সংস্কৃত ও প্রাচীন জাভা বিষয়ে ডাচ পণ্ডিতদের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের মধ্যে অন্যতম। জাভাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের উপরে তাঁর বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে। জাভার কবি ভাষাতে রচিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (১৯৩৩) ও ভীষ্ম পর্ব (১৯৩৬) গ্রন্থদ্বয়ের সংস্করণে এবং 'ইন্দোনেশিয়াতে সংস্কৃত' নামক গ্রন্থে (১৯৫২) মৌলিক চিন্তা, সন্ধানী মন, ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর তিনি বেদ-চর্চা আরম্ভ করেন। অথর্ববেদের রচনাভঙ্গী, বেদে প্রযুক্ত অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহু সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।[৮] এই সমস্ত গ্রন্থের ভিতরে 'On the relation between gods and powers in the Veda' গ্রন্থখানি (১৯৫৭) ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্‌দের নিকটে মূল্যবান। ভারতীয়ধর্ম তাঁর অন্যতম আলোচ্য বিষয়।[৯]

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে জে. এ. বুইতানেন, এম. জে. ড্রেসডেন এবং জে. সি. হিস্‌টারম্যান যথাক্রমে রামানুজ, মানবগৃহ্যসূত্র এবং রাজসূয় যজ্ঞের উপরে গবেষণা করেছেন।[১০]

এতদ্ব্যতীত উট্রেক্টে ভারতীয় দর্শন-ইতিহাসের অধ্যাপক জি. আবোরহামার ন্যায় ও বেদান্ত দর্শনের ছাত্র; তর্কশাস্ত্রের উপরে একখানি গ্রন্থরচনাতে তিনি ব্যাপৃত। প্রাচ্যধর্মের অধ্যাপক ডি. জে. হোয়েন্সের 'বেদে শান্তি' পুস্তকটি বহু নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ।[১১] যোহান হুইজিং (১৮৭২—১৯৪৫) ভারতীয় নাটকে বিদূষক; পাদ্রী বি. এসারম বাক্ বা শব্দব্রহ্ম; ত্রকার্ণ হিন্দু-জাভা প্রভাবিত একখানি ঐস্লামিক গ্রন্থ; সি. ক্লার্ক ডাচ লিপিতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা ও কাজ করেছেন।

পাঁচ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে গ্রোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপনা ও গবেষণার বন্দোবস্ত হয়। অধ্যাপক জেকোর-এনসিঙ্ক সেখানকার কর্ণধার। তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও সাংখ্য দর্শনের চর্চা করেন; 'রাষ্ট্রপাল পরিপৃচ্ছা' গ্রন্থখানির ডাচ ও ইংরাজি ভাষাতে তিনি অনুবাদ করেছেন। অন্যান্য ভারত-তত্ত্ববিদ্দের মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক যুঙ্গ প্রসন্নপদা গ্রন্থখানি সম্পাদন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন; এর আংশিক অনুবাদ তাঁরই কৃত। এগারমণ্ট অশোকের রাজত্বের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন; অশোকের শিলালেখ ও কিংবদন্তীর তুলনামূলক আলোচনা করে আপেক্ষিক কাল নির্ণয় করেছেন (১৯৫৬)। তাঁর পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। মিস্ ডঃ গেল্ডার বৃদ্ধবয়সে মানব শ্রৌতসূত্রের সানুবাদ।[১২] সংস্করণ সমাপ্ত করেছেন। বৃহদারণ্যকের "আত্মাকে" তিনি পাশ্চাত্য মতে আধুনিক মনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন (১৯৫৭)। জাভা ও ভারতীয় শিল্পে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বস 'হিরণ্যগর্ভ' পুস্তকখানিতে ভারতীয়, যাভা ও খমেরের ভাস্কর্যের লক্ষণ ও প্রতীকের উৎসের সন্ধান করে সিদ্ধান্ত করেছেন। ডঃ পি. এইচ. পটের 'যোগ ও যন্ত্রে'র উপরে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা; তিনি পুরাতত্ত্ব ও আর্ট চর্চা করেন।

কার্ণের পরে প্রাচীন জাভার এপিগ্রাফি চর্চা করতেন ডঃ ব্রাণ্ডেস (১৮৫৭—১৯০৫)। তাঁর পূর্ব-যাভার বৌদ্ধ মন্দিরের উপরের গ্রন্থটি (১৯০৪) জেমস্ বার্জেস কর্তৃক উচ্চ প্রসংশিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগঠক ডঃ ক্রম (১৮৮৩—১৯৪৫) জাভাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের কথা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। অনুরূপ কাজ করেছেন স্তুতারহিম (মৃত্যু—১৯৪২)। 'হিন্দু সুমাত্রা'' এবং

'ইন্দোনেশিয়াতে রাম-কথা ও রাম-রিলিফ' গ্রন্থদ্বয় তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে।

আর অধিক উদাহরণ উল্লেখ না করে আর্নল্ড বাকের (১৮৯৯—১৯৬৩) কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। তিনি বংলাদেশে বহুদিন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বাংলার কীর্তন এবং ভারতীয় ও রবীন্দ্র সংগীতের উপরে তাঁর গবেষণামূলক রচনা তাঁকে সংগীত জগতে স্মরণীয় করে রাখবে। কালাণ্ড ও ফোগেলের সংস্পর্শে এসে তিনি ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'সংগীত-দর্পণের' উপরে তাঁর গ্রন্থ বিদগ্ধতা, মৌলিক চিন্তাধারা ও সত্যানুরাগের সাক্ষ্য বহন করে।

ওলন্দাজদের ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা চিত্রিত করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে হল্যাণ্ডে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ অনেকদিনের ; কার্ণ ও তাঁর পরবর্তীকাল থেকে গুরুপরম্পরায় ভারতবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা ও অনুশীলনের কাজ চলে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে যুগান্তরকারী রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্যান্য পরিবর্তন সত্বেও ভারততত্ত্ব অনুসন্ধানের আগ্রহ বেড়েছে বই কমেনি। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে ও হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে নতুন নতুন সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হচ্ছে। এদের মধ্যে Indo-Iranian Journal, Central Asiatic Journal, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Oriens, Contributions to Indian Sociology উল্লেখযোগ্য।

ভারত ও হল্যাণ্ডের মৈত্রীর সেতুবন্ধনে এই যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে থাকবে।

পাদটীকা :

১। This is still, perhaps, the most complete account of Southern Hinduism, *though by far the earliest.*

২। "The Dutch books were among the sources of first hand knowledge about India, which after the middle of the 17th century exerted an enormous influence on the intellectual elite which then woke up to the fact that there are more types of human civilization than the only known European variety" (Gonda).

৩। প্রথম হিন্দুস্থানী ব্যকরণও ডাচ ভাষায় রচিত হয় (১৬৯৮)। রচনা করেন ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী জার্মান বংশোদ্ভব কেটলার (Joan Josua Ketelaar) গ্রন্থখানি

উট্রেক্টের অধ্যাপক ডেভিড মিলিয়াস কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়ে লাইডেন হইতে প্রকাশিত হয়েছে (১৭৪৩)।

৪। 'a schlolar of great merit, a representative of old generation of giants'.

৫। বৌধায়ন (১৯০৪—২৩) ও বৈখানস শ্রৌতসূত্র, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদ (১৯৩১); সানুবাদ বৈখানস স্মার্তসূত্র (১৯২৭—১৯২৯)

৬। A manual of Sanskrit Phonetics.

৭। আটটি সংস্কৃত নাটক ডাচ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু মঞ্চস্থ হয়েছে। শকুন্তলা ও মৃচ্ছকটিক নাটকদ্বয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৮। Rig vidhan (১৯৫১) : Languages of the Veda (১৯৫৯) ; Epithet in the Rigveda (১৯৫৯) ; Vision of the Vedic poets ইত্যাদি।

৯। Aspects of early Visnuism (১৯৫৪)

১০। "model of modern Vedic research and it is hoped that it will inspire many to take up once again the classics of pre-historic India". (BSOAS, XXII)

১১। "a valuable contribution to our knowledge of Indian religious terminology" (Gonda)

১২। "It is hoped the work, which initiates a new epoch in the investigation of Indian and Ceylonese history will soon be followed by similar studies on either periods." (BSOAS, XIX, 601).

ভাতের জন্যে

কুমার মিত্র

ঝুলের মতো অন্ধকার থিকথিক করছে। সারা আকাশটা যেন ভূষোকালিতে ভরে আছে। সাদা ভাজা খইয়ের মতো ফুটফুটে নক্ষত্রগুলোই শুধু দুচার ছিটে আলো জড়িয়ে আছে গায়ে। নচেৎ সব কিছুই অন্ধকার। গাছপালা মাঠঘাট পর্যন্ত কালিঝুলি মেখে ভূত সেজে বসে আছে চুপচাপ। কি তিথি মনে নেই, তবে কৃষ্ণপক্ষ। তাই পৃথিবীর এমন প্রেতসজ্জা।

এই আকাশপাতালভরা অন্ধকারের মধ্যে বনবাদাড় জল-জাঙাল ভেঙে কোম্পানীর মস্ত উঁচু বাঁধটা পেরিয়ে ভূষণ খালের ধারে এসে দাঁড়াল। হেঁটে এল না, যেন একটা নিঃশব্দ সরীসৃপের মতো বুক বেয়ে বেয়ে চলে এল। গাইঘাটার খাল নামে পরিচিত খাল দক্ষিণবাহিনী হয়ে দামোদরের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে মাইলখানেক দূরে। নামে খাল হলে কি হয়, আসলে একটা ছোটখাটো নদী। নদীর মতো চ্যাটালো নয়, বেশ গভীর। স্রোতও খর। তর্জনগর্জনই বা কম কি! খালের ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে চোখ ফেলল ভূষণ। অবিচ্ছিন্ন একটি কলকল শব্দ উঠছে। কিছুদিন আগে হড়পা নেমেছিল। মাটি ধ্বসে-ক্ষয়ে বেশ খুলে গিয়েছে খাল। চেহারাটা তাই বড়সড় ঠেকছে, হাঁকডাকও বেড়েছে সেই সঙ্গে। এখন জোয়ার চলছে, তাই এমন ভরভরন্ত। হাত দুয়েক নিচেই জল। আঁধারের গাঢ়তার জন্যে জল বলেই মনে হচ্ছে না, কে যেন আলকাতরা মাখা টিনের পাত খালের গর্ভে বিছিয়ে দিয়েছে বরাবর।

জল থেকে চোখ তুলে ভূষণ শিকারলুব্ধ শেয়ালের চোখের তীক্ষ্ণতা নিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকাল। বাস্তবিকপক্ষে ঘন আঁধারের মধ্যে শেয়ালের মতোই জ্বলছিল ওর চোখ। অন্য কেউ হলে গাঢ় অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে কিছুই দেখতে পেত না। কিন্তু ভূষণের কথা আলাদা। তার রাতঘাঁটা চোখ

সমস্ত দেখতে পেল। সব কিছু। বাঁধের ওপর শ'খানেক হাত দূরে বুড়ো অশথটার কোলে ঘেঁষে যে একটা ধারী শেয়াল কিংবা আধলা কুকুর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, সেটাও তার নজরে পড়ল। না, কেউ নেই কোথাও। একটানা ঝিঁঝির কর্কশ শব্দ ছাড়া ডাঙার ওপর কোন শব্দও নেই।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে গিয়েও ভূষণের খেয়াল হল নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন মানেই হয় না। এখন সে ঠিক একটা উপবাসী গরগরে অজগরের খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অজগরটা যে কোন মুহূর্তে বিশাল একটা হাঁ করে তার দিকে তেড়ে আসতে পারে। চারপাশে যা ঝোপঝাপ আর গাছপালা! ওর আড়ালে আড়ি পেতে কেউ তার গতিবিধির দিকে নজর রাখাও কিছু বিচিত্র নয়। অথবা সেই পাজীর পা ঝাড়া শয়তানটা দুটো তাগড়া জোয়ান পাইককে খাল পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেও অবাক হবার কিছু নেই। একটু আগে ভূষণ খাঁচার মধ্যে একটা অজগরের কথা ভাবছিল। আসলে অজগর একটা নয়, দুটো। পাইক দুটোকে দুটো অজগর ছাড়া কিছুই ভাবা চলে না। তেমনি ভয়ঙ্কর আর হিংস্র। দুটো মোষের আহার টেনে লোকদুটো সারাদিন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। সন্ধ্যে হলেই গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। তারপর দুজনে দুখানা তেল চুকচুকে পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে সারারাত চতুর্দিক টহল দিয়ে ফেরে। অন্ধকারেই ওদের চলাফেরা। সাপের মতো নিঃশব্দে ওরা হাঁটে, মুখে কোন কথা বলে না, অন্ধকারের মধ্যেও ইঙ্গিতে ইশারায় ওদের কথা হয়। বনবেড়ালের মতো চোখ দুটো জ্বলে। কাউকে ভয়ডর নেই; সাপখোপেরও না, অপদেবতারও না। কাজ সেরে মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া। ওই মানুষ দুটোকেই বড় ভয় ভূষণের। সেও জোয়ান মানুষ, তেজও বড় কম নেই, দুবছর আগেও রামদার এক কোপে ভর জোয়ান মোষের গলা ফাঁক করে দিয়েছে। কিন্তু ওদের কাছে সে কিছু নয়। কোথা থেকে যে মুহূর্তের মধ্যে উড়ে আসবে ওরা আর লাঠির এক ঘায়ে যুটি ফলের মতো মাথাটা চৌচির করে দেবে সে টেরটিও পাবে না। তারপর লাশটা খালের আধবুক পাঁকের তলায় পাচার করে দিলে কাকপক্ষীও জানতে পারবে না।

ভূষণের পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বরফঠাণ্ডা জলের স্রোত বয়ে গেল যেন। গায়ের রোঁয়াগুলো শুয়োপোকার রোমের মতো খাড়া হয়ে উঠল। ভূষণ আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। ভূষণ ভয় পেয়েছে, ভীষণ ভয় পেয়েছে। পা দুটো কেমন অবশ লাগছে, গলার ভেতরটা খরার মাঠ

হয়ে উঠল যেন। সে কি পালিয়ে যাবে? সামনের ওই বাঁকাবন কিংবা ওই ঝাঁকড়া বটগাছটার আড়ালে পাজী দুটো ঘাপটি মেরে নেই তো! আর যে লাঠি দুটোকে ওরা কখনও কোন মুহূর্তে কাছছাড়া করে না সে দুটো ওদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে তো! এখুনি যদি তারা হাওয়ার সওয়ার হয়ে সেই মরণবাণ দুখানা হাতে নিয়ে তার ওপর চড়াও হয় তাহলে সে কি করতে পারে! যদি সেই শালগুঁড়ির মতো লাঠিদুটোর দুচার ঘায়ে তাকে শেষ করে দিয়ে তার মৃতদেহটি খালের গভীর পাঁকের তলায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় তাহলেই বা কে জানতে পারছে! এমনি কতজনকেই ওরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে! তারপর দুচারদিন সেই বে-হদিশ লোকটাকে নিয়ে হৈচৈ হয়েছে, থানাপুলিশ হয়েছে। তারপর একসময় গোলমাল থেমে গিয়েছে। সব জেনেও মানুষ মুখ খোলেনি। ওদের কোপে পড়বে, এমন বুকের পাটা কার!

এই নির্জন নিঃশব্দ কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার রাত্রে তাকেও যদি অমনি করে—

এর বেশী ভাবনাটাকে প্রশ্রয় দিল না ভূষণ। একবার ভাবতে আরম্ভ করলে ক্রমশ বেড়েই চলে, থামতে চায় না। না, সে আর ভাববে না। যা হয় হোক। এই দোটানা ভালো লাগে না। সেও কমজোরী নয়, তারও গায়ে খ্যাঁকশেয়ালের ক্ষিপ্রতা। আগেভাগে টের পেলে লড়াই করতে না পারুক, পালাতে অন্তত পারবে। তারও নাম ভূষণ কামার। রক্ষেকালীর চত্বরে একসময় একনাগাড়ে খাঁড়া না পাল্টে পঞ্চাশটা পাঁঠার মাথা নামিয়ে দিয়েছে। আশপাশের পাঁচ দশখানা গাঁয়ের লোক্ এক ডাকে তাকে চেনে। সেও ডাকসাইটে ভূষণ। খালের জলে একবার ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারলে ধরে কার সাধ্য। ডুব সাঁতারে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো লোক এ তল্লাটে কেউ নেই। তবে এতে ভয় কিসের! ভয়ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভূষণ বুক চিতিয়ে দাঁড়াল।

'শালা শয়তান!' কালনাগের মতো হিসহিসে আক্রোশভরা গলায় বিড়বিড় করে উঠল ভূষণ। হ্যাঁ, সেই সতীশ জোয়ারদারকে উদ্দেশ করেই শব্দদুটো ছুড়ল সে। সতীশ জোয়ারদার; হেন অপকর্ম নেই যা লোকটা করেনি, যার মতো হাড়বজ্জাত লোক ভূষণ তার জীবনে দুটি দেখেনি, এই জমিদারী না-থাকার যুগেও লোকটা একটা ছোটখাটো জোতদার। খেত-খামার বাগানবেড়ের আর শেষ নেই। এ সবের অধিকাংশই হচ্ছে

জবরদখল। অসৎপথের উপার্জন। একসময় নামকরা লেঠেল ছিল, মোটা পয়সা নিয়ে এক পক্ষের হয়ে অন্য পক্ষের মাথা ভেঙে আসত। পরে যখন বুঝল এতে বেশী লাভ নেই, তখন লাঠির প্রতাপটাকে নিজের কাজে লাগাল। আর আশ্চর্য, লাঠির জোরেই মাটির মালিক হয়ে উঠল।

দু দুটো মস্ত ধানের গোলা জোয়ারদারের। দুটো গোলাই ধানে ঠাসবোঝাই। বছরের সব সময়েই ঠাসা। মাঠ যে বছরে খরায় খাঁ খাঁ করে কিংবা অতিবৃষ্টিতে থইথই করে, কারো গোলায় এক দানা শস্তও নেই, সে বছরেও জোয়ারদারের গোলা আকণ্ঠ ভরপুর। অথচ সারা বছরটাই বিক্রীবাটার কাজ করছে সে। শত শত মণ ধান নামিয়ে নিয়ে এই গোলা হাল্কা হয়ে গেল, পরমুহূর্তেই বোঝাই। রাতারাতি কোথা থেকে যে এসে জমে গেল, সে রহস্য উদ্ঘাটন করা দেবতারও অসাধ্য। অন্তত রহস্যসন্ধানীরা তাই বলে। কেউ কেউ বলে জোয়ারদার একজন ভক্ত কালীসাধক। কালীর অনুগ্রহেই তার এমন বাড়বাড়ন্ত। ভূষণ কিন্তু এ গল্প বিশ্বাস করে না। তার বিশ্বাস হয় না যে অমন একজন হাড়পাজী লোককে মা কালী কৃপা করতে পারে। দেবতার চোখ নেই নাকি!

গত বছর খরা গিয়েছে। তিলমাত্র ফলন হয়নি মাঠে। আদিগন্ত ক্ষেত শুকিয়ে গিয়েছিল বাজপড়া গাছের মতো। এ বছর গেল অতিবৃষ্টি। জলস্ফীতিতে মাঠ হয়ে উঠেছিল একটা আথালি-পাথালি দরিয়া। বিশ বাঁও জলের তলায় তলিয়ে গেল বীজধান। সেইসঙ্গে তলিয়ে গেল গ্রামের হতভাগ্য মানুষগুলোর সুখ-সৌভাগ্য।

ভূষণ জাতচাষী নয়, কামার। চাষবাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু সম্পর্কটা সে নিজেই গড়ে নিয়েছিল। পুজোআচ্চায় ডাক পড়ত বটে, কিন্তু পাওনাগণ্ডা আর আগের মতো মিলত না। আর পাঁঠাবলির কাজটা ভালও লাগত না ইদানীং! তাই ছেড়ে দিয়েছিল ও কাজ। কামারের দোকান একটা ছিল বটে, সেটাও বছরে ছমাস না চলার মতো। লোহালক্করের কাজ গ্রামে করাবার মতো মানুষ কোথায়? গঞ্জের হাটে একটা আলতা শাঁখা সিঁদুর ইত্যাদির দোকান দেবে ভেবেছিল, মূলধনের অভাবে সেটা পরিকল্পনাই রয়ে গিয়েছে। শেষতক তাই পৈতৃক কিছু জমিজমা থাকায় চাষের কাজেই নেমে পড়েছিল। কিন্তু সেখানেও দুর্ভাগ্য তার সঙ্গ ছাড়ল না। পরপর দু'সন অজন্মায় অভাব তার হাড়মাস

চুষে খেয়ে নিয়েছে। অথচ সংসারে তার পোষ্য কম নয়, অল্প করে জনা ছয়।

সতীশ জোয়ারদারের গোলাভরা ধান। সে ধান সে লোকজনের দায়ে-আপদে চড়া সুদে দাদনও দিয়ে থাকে। অসময়ে একমণ দিলে ধান ওঠার মরশুম এলে দেড়মণ ফিরে দিতে হবে। লোকটার খপ্পরে পড়লে দুর্ভোগের অন্ত থাকে না জেনেও দাদনের আশাতেই জোয়ারদারের গদীতে গিয়েছিল সে। তার মতো অনেকেই গিয়েছিল ওই আশাতে। সকলেই ফিরে এসেছে হতাশ হয়ে।

জোয়ারদারের সেই নোংরা খিঃখিঃ হাসিটি এখনও যেন কানে ভাসছে ভূষণের। আর তার বিশ্রী মুখভঙ্গী এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। কালোপানা বীভৎস মুখটা ব্যঙ্গের হাসিতে আরও বীভৎস হয়ে উঠেছিল। ধান তো দেয়নিই উপরন্তু বিদ্রূপ। সে বিদ্রূপে সারা শরীরের সমস্ত রক্তকণিকায় আগুন ধরে যায়। ভূষণের সারা দেহেও আগুন জ্বলে উঠেছিল। তার হাতুড়ি-পেটা হাতটা নিশপিশ করে উঠেছিল। লাল টকটকে লোহার পিণ্ডের ওপর মস্ত যে হাতুড়িখানা সে পেটে সেই হাতুড়িটা যদি লোহার বদলে ওই নীরেট মাথার ওপর বসিয়ে দিতে পারত তবে সে শান্তি পেত। কিন্তু শান্তি পাওয়া তার হয়ে ওঠেনি। কেবল সেই দুরন্ত ইচ্ছেটা ভেতরের তাপে ফুলেফেঁপে ঢাউস হয়ে উঠে ঝলসে দিয়েছে তার সমস্ত শরীর মন।

'কি রে, জাত হারিয়ে বোস্টম, তুই হেথা কেন?' একটা গা-জ্বালানো হাসি হাসতে হাসতে কথাগুলো ভূষণের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল জোয়ারদার। ভূষণের মনে হয়েছিল দাদন-প্রত্যাশী লোকগুলোর মুখও চাপা হাসিতে ভরে উঠেছিল। জোয়ারদারের রসাল বিদ্রূপ তারা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে। ভূষণের চোখজোড়া ধ্বকধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারে নি সে।

'শালা বেজন্মা, হারামখোর।' ভয়ঙ্কর আক্রোশে গাল পাড়ল ভূষণ। চোখদুটো ধ্বকধ্বক করে জ্বলে উঠল, জোয়ারদারের গদীতে যেমন জ্বলে উঠেছিল। 'তোমাকে মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও শালা।' সামনেই যেন জোয়ারদার দাঁড়িয়ে আছে, এমনি ভঙ্গীতে বলল ভূষণ। আর জোয়ারদারের রাগে কালো মুখখানার দিকে চেয়েই যেন দুপাটি দাঁত মেলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাসল। হাসল, নাকি ভেংচি কাটল, কে জানে!

ভূষণের গা উদোম। পরনে ছোট্ট একটা কাপড়। মালকোঁছা আগে সাঁটাই ছিল। আর একবার সেটাকে গুছিয়েগাছিয়ে নিল ভূষণ। বাড়তি অংশগুলো জুৎ করে এঁটে নিল। কোমরে একটা গামছা শক্ত করে বাঁধা ছিল। তার ঝুলন্ত দুটো প্রান্ত ঘুরিয়ে নিয়ে কাঁছার সঙ্গে ভালো করে গুঁজে দিল। আর ডানদিকে কোমরে কি যেন একটা বস্তুর অস্তিত্ব সন্ধান করল। জিনিসটি টেনে বের করল ভূষণ। সম্পূর্ণ তৈরী হবার আগে দরকারী জিনিসগুলোর একবার তদারক করে নেওয়া ভালো। মাঝারি একটা ছোরা। আঁধারের মধ্যেও ইস্পাতের ধূসর শুভ্রতার কিঞ্চিৎ বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা গেল। ভূষণের নিজের হাতে তৈরী ছোরা। ক্ষুরের মতো এতে দাড়ি চাঁছা যায় না বটে তবে ক্ষুরের চেয়ে কিছু কম যায় না। জুৎমতো বসাতে পরেলে এক আঘাতেই পিঠ পর্যন্ত পাচার। আলতো আঙুলের স্পর্শ দিয়ে সাবধানে অথচ যেন পরম আদরের সঙ্গে ছোরার ধার পরীক্ষা করল। বাঁটটায় অনাবশ্যক একটা চাপ দিল সজোরে। যেন নিজের সঙ্গে সঙ্গে ছোরাটাকেও উত্তপ্ত করে নিতে চাইল। গোছগাছ করার কাজ শেষ হলে খরসান দৃষ্টি মেলে দিল খালের পাথুরে কালো গর্ভে।

দূরত্বটা শ দুই হাতের বেশী হবে না। প্রায় আধ মাইলটাক সরকাঠির মতো সরলরেখায় এসে খাল যেখানে মস্ত একটা বাঁক নিয়ে আবার সোজা উত্তরমুখী হয়েছে সেখানে একটা বড়োসড়ো অশথগাছ। তার তলাতে একটা প্রায় দুহাজারমণী নৌকা গাছের ছায়ার সঙ্গে লেপ্টে আছে। ভূষণের শাণিত চোখ আঁধার ফুঁড়ে ঠিকই পেঁৗছে গেল সেখানে। কোন আলো জলছে না, খুটখাট শব্দও নেই। পশুপ্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটাও যেন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন।

চাল আছে ওতে, চাল। প্রায় দুশো বস্তা তাজা চাল। আঁধারের আড়াল নিয়ে চাল পাচার করছে সতীশ জোয়ারদার। চাষীদের রক্ত জল-করা পরিশ্রমের প্রাপ্তি তাদের দারিদ্র্যের সুযোগে অল্প দামে কিনে নিয়ে মোটা টাকায় বেচে দিচ্ছে দূর গঞ্জের কোন আড়তদারকে। এই চোরা-চালানের কারবারে রাশিরাশি টাকা পিটে নিচ্ছে জোয়ারদার। রাশিরাশি তোড়াবন্দী টাকা আসবে ওই বস্তাগুলোর বিনিময়ে। অথচ তারই গ্রামের মানুষগুলো কুকুর-ছাগলের মতো না খেয়ে মরবে। ভূষণের সারা শরীরটা রী রী করে উঠল রাগে আর ঘৃণায়। অথচ এর কোন প্রতিকার নেই। একেবারেই নেই কি ?

কিছুটা আছে বৈ। সেইজন্যেই তো এই নৈশ অভিযান। নৌকোটাকে আর এগোতে না দিলে কেমন হয়? বস্তাগুলো আড়তদারের মালখানায় না গিয়ে যে সব ঘরে দুচার দিন উনোনে হাঁড়ি চড়েনি তাদের কাছে পৌঁছে দিলে কেমন হয়? শিশু বুড়ো বুড়ী যুবতীদের মুখে এক আশ্চর্য সুখের ছবি আঁকতে আঁকতে ভূষণ কোমরের কটিতে গোঁজা ছোরার মুখটা শক্ত করে চেপে ধরল।

নৌকোটা সতীশ জোয়ারদারেরই। আড়দারেরা এখান থেকে চালধান নিয়ে যেতে সাহস পায় না। লুঠের ভয়। জোয়ারদারকেই নিজের নৌকোয় আগ বাড়িয়ে ঠাকুরচকের হাটতলা পর্যন্ত মাল পৌছিয়ে দিয়ে আসতে হবে। সেখান থেকে নৌকো বদল হয়ে মাল চলে যাবে রূপনারাণের ধারের মস্ত বড় এক গঞ্জে। নৌকো ছাড়বার কথা মাঝ রাত্রে। হয়তো বা মাঝ রাতে একটু ভাটির টান ধরলে। এই সময়টাই সব থেকে নিরাপদ। আর বড়জোর ঘণ্টা-খানেক বাকি আছে। ভূষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় বোঝবার চেষ্টা করল।

খালপারের বাঁশবনের মধ্যে একদল শেয়াল সমস্বরে হুক্কা হুয়া ডেকে উঠল। রাতের সজাগ প্রহরীর চোখে একটুও ঘুম নেই। ভূষণ বুঝল এখন কাঁটায় কাঁটায় মধ্যরাত্রি। অন্ধকারের ঘনতা তার চরমে পৌছেছে। ভূষণের অচল শরীরটা কিসের একটা নাড়া খেয়ে যেন সচল হয়ে উঠল।

এখন নৌকাখানা প্রায় অরক্ষিত। কান পর্যন্ত জ্বালা করে ওঠা পাঁঠার ঝালচচ্চড়ি খেয়ে আর স্পিরিট গিলে ভাম হয়ে টলতে টলতে এখুনি এসে পড়বে মাঝিমাল্লারা। মাঝিমাল্লা নামটা যেমন নিরীহ আসলে কিন্তু ওরা তা নয়। ভীমের মতো দশাসই জোয়ান সব এক একজন। ধেনো খেয়ে চোখ করমচার মতো লাল, মুখে অশ্রাব্য গান আর গালিগালাজ। ছুরিছোরা লাঠি-সোঁটা কিছু না কিছু প্রত্যেকের সঙ্গে। কিন্তু ওদের এসে পড়তে এখনও কমসে কম আধ ঘণ্টা, ভূষণ সব জানে। নৌকোয় সে একজন আগলদার রেখে গেছে, তাও অজানা নয় তার। মাত্র একজন? কিন্তু এর বেশী আগলদার রাখার দরকার আছে বলে মনে করে না সতীশ জোয়ারদার।

কিন্তু সতীশ জোয়ারদারের ওপর টেক্কা মারবার মতো মানুষ কি পৃথিবীতে নেই? নিজেকে নিজেই শুধোল ভূষণ। 'আছে বৈকি।' ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল ভূষণ। জোয়ারদারের ওপর এক হাত নিশ্চিতই সে নেবে। মাত্র এক-জন আগলদারকে ঘায়েল করতে পারবে না সে? পারতেই হবে। সে যে

অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা শক্ত। বাঘের মতো লোকটার ওপর লাফিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরবে লোকটার। তারপর নৌকার কাছি কেটে দিয়ে জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে মাইলখানেক দক্ষিণে গাইঘাটার মোহনায় পৌঁছতে পারলেই কেল্লা ফতে। ঘণ্টাখানেক পরে জোয়াদারের লোকজন আঁতিপাঁতি করে নৌকো সন্ধান করে ফিরবে তখন দুশোখানা চালভর্তি বস্তাই চিরকালের জন্যে নিখোঁজ হয়ে গেছে। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আর মুখের ওপর একটা কুটিল হাসিকে ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হতে দিতে দিতে ভূষণ জলে পা রাখল।

ভীষণ তোড় জলে। হড়পা এসে খালটাকে নতুন যৌবব এনে দিয়ে গেছে। খালটা যেন যৌবনজ্বালায় ছটপটিয়ে মরছে। একটু বোসমাল হয়ে পড়লেই নাকানিচোবানি খাওয়াবে। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে ডুবজলে নামল ভূষণ। কেবল মাথাটা জেগে রইল। আস্তে আস্তে সাঁতার দিতে থাকল সে।

রাত্রির শিশিরে ভিজে জল যেন হিম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে শৈত্যটা সয়ে এল ভূষণের। একটু যে ভয় ভয় না করছিল এমন নয়। জোয়ারদারের ভয় তো ছিলই, এ ছাড়াও মধ্যরাত্রের খালের কালো জলে সাঁতার দেবার একটা আবছা বিভীষিকাও তাকে অবশ করে তুলছিল। তবু এখানে কোন রাক্ষুসে জলজন্তুর ভয় নেই। ভূষণ সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করল।

মাত্র শ দেড়েক হাত এগোতেই অনেক্ষণ লেগে গেল। কতক্ষণ, সঠিক ঠাহর কতে পারল না, তবে পনেরো মিনিটের কম নয়। আসলে সাঁতার দিয়ে আসবার তেমন চেষ্টা করেনি সে। তার দরকারও ছিল না। শরীরটা ভাসিয়ে রেখে জলস্রোতের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল নিজেকে। এমনকি চার-দিক মাঝেমাঝে দেখে নেবার প্রয়োজনে গতিবেগ সংবৃতও করতে হচ্ছিল। মাত্র হাত পঞ্চাশ যখন বাকি আছে তখন গতি একেবারে থমকে দিয়ে নৌকোর সমস্ত অবয়বে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য এখান থেকে সমস্ত অংশে চোখ ঠিকঠিক পড়া সম্ভব নয়, ফলে কেউ আড়ি পেতে লুকিয়ে থাকলে দেখতে পাওয়াও অসম্ভব।

আরও খানির এগোল ভূষণ। আবার দেখল। আবার এগোল। কেউ নেই কোথাও। আর মাত্র হাত বিশেক যখন বাকী তখন লম্বা একটা শ্বাস টেনে ডুব দিল সে। ভুস করে যেখানে ভেসে উঠল তার হাতটাক দূর নৌকোর হাল। হালটাকে আঁকড়ে ধরে হাঁপাতে লাগল ভূষণ। পরিশ্রম

বিশেষ হয়নি, কিন্তু উদ্বেগ তাকে কিছুটা ক্লান্ত করে দিয়েছে। একটু ধাতস্থ হয়ে নৌকোর তৈলাক্ত গা ধরে ধরে অপেক্ষাকৃত নিচু অংশটায় চলে এল। জলের সমতা থেকে এ জায়গাটা হাত দেড়েক উঁচু। হাত বাড়িয়ে পাটাতনের স্পর্শ পেল ভূষণ। তারপর খোলের ওপরভাগের শক্ত একটা কাঠ ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে উপরে ছুঁড়ে দিল ভূষণ নিঃশব্দে। কিন্তু যতই নিঃশব্দ হবার চেষ্টা করুক, একটু আধটু খুটখাট শব্দ জাগলই। নিঃশ্বাস রোধ করে মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ভূষণ। এই সময় তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছিল, হাত পা ভীষণ শিথিল মনে হচ্ছিল। শরীরের সব উত্তাপ কে যেন হরণ করে নিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করছিল ভূষণ। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না।

একটা কালপ্যাচা বিশ্রী একরকম গোঙানি তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। অমঙ্গল আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ভূষণের। মনে হল যেন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে পালিয়ে যায়। কিন্তু জোয়াদারের ব্যঙ্গে বীভৎস পাথুরে মুখটা মনে পড়ে যাওয়ায় ভয়টাকে ধিক্কার দিল ভূষণ। নিজেকেও ছিঃ ছিঃ করে উঠল।

ঘরের মধ্যে টিমটিম করে ভূষোমাখা হ্যারিকেন জ্বলছে একটা। অস্পষ্ট আলোর প্রলেপ মেখে ভেতরের অন্ধকার ঈষৎ ফিকে। ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসছে। আগলদার ঘুমের মধ্যে মরে গিয়েছে। বিড়ালের গদিমোড়া পায়ের নৈশঃব্দ্য নিয়ে ঘরের দিকে এগোল ভূষণ। ডান হাতটা ছোরার হাতলে। বেশী বাগড়া দিলে খতম করে দিতেও পেছপা হবে না ভূষণ।

একটা শেয়াল যেন খোপের মধ্যে হাঁস খোঁজার জন্যে উঠোনে ঢুকেছে, এমনি সতর্কতা নিয়ে ঘরে পা দিল ভূষণ। লোকটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকিয়ে। একটা ন্যাকড়ার ছোট্ট বল বের করে লোকটার হাঁ-করা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। না, ঘুম ভাঙার কোন লক্ষণ নেই, অস্বস্তিভরে একবার নড়েচড়ে উঠল কেবল। শক্ত পাকানো নারকেল ছোবড়ার দড়ি দিয়ে দুটো ছড়ানো পা একত্র করে আস্তেআস্তে বাঁধতে লাগল ভূষণ। আশ্চর্য, লোকটা মরে গেছে নাকি! ভূষণের ভয়-শুকনো মুখেও হাসি জেগে উঠল।

দুটো হাতে যখন শক্ত বাঁধন পড়ে গেছে তখন ঘুম ভাঙল আগলদারের। কিন্তু তখন আর বাধা দেবার সামর্থ্য নেই। একটা শক্ত ন্যাকড়ার ফালিতে মুখটা বাঁধতে আরম্ভ করেছে ভূষণ। বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টায় বাঁধা হাত-পা

একটু-আধটু ছুঁড়ল, মুখখানা এদিক ওদিক ঘষল। 'থাক শালা বাঁধা পড়ে। তোর জোয়ারদার বাবা এসে খুলে দেবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ভূষণ। একটা গুরুতর কাজ এতখানি সহজে চুকে গেলেও ভূষণের বুকের ভার এতটুকুও কমল না। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী কোন ঘুলঘুলি না পেয়ে ভেতরেই পাক খেয়ে মরছে, এমনি একটা অস্বস্তি ঘুলিয়ে উঠতে থাকল বুকের মধ্যে। ভূষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকটাকে টান করে খালের ভারী জোলো বাতাস অনেকক্ষণ ধরে টানল। তারপর একটা ভীষণ কর্তব্যের তলব পেয়েই যেন ব্যস্ততায় ছটপট করে উঠল সে।

'কি ভীষণ শক্ত কাছিরে বাবা', নোঙরের সঙ্গে লাগানো কাছিটা ছোরা দিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে পেঁচাতে পেঁচাতে বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে উঠল, 'হারামজাদা যেন কইমাছের জান।' কিন্তু ছোরা একটুও শিথিল করল না। ছুরির ঘষটানিতে একরকম গা-শিরশির করে ওঠা আওয়াজ উঠছে। উঠুক, ভূষণ গ্রাহ্য করল না। ভূষণের সবল হাতের পেশী যখন ব্যাঙ ধরা দাঁড়াশের গলার মতো ফুলে উঠছে, গা ঘেমে উঠেছে, ছোরার ধার প্রায় পড়ে এসেছে, তখন কটাৎ করে একটা শব্দ তুলে কাছিটা দুভাগ হয়ে গেল। আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বাঁধনহীন নৌকোখানা সশব্দে একটা মোচড় খেল। হালখানা কড়কড় শব্দ তুলল।

ভূষণ চোখের নিমেষে দৌড়ে গিয়ে হালের কাছে মাঝি হয়ে বসল। হ্যাঁ', মাঝির কাজটাও দায়ে বিপদে অল্পসল্প চালাতে পারে। খালেক সাহেবের খটিতে দিনকতক মালবওয়া নৌকোর মাঝিমাল্লার কাজও করেছিল ভূষণ। এইজন্যে এ কাজের ভার তাকেই দিয়েছে দলের লোকেরা।

মাঝির কাজটা মোটেই সহজ নয়; দীর্ঘদিন অনভ্যাসের পর কথাটা হাড়ে-হাড়ে বুঝল ভূষণ। বিশেষত অত বড় নৌকোর হাল কখনও সে ধরেনি। খালেক সাহেবের নৌকো মাত্র পাঁচ শ মন বোঝাই নিত। বড় জোড় বড়-সড় একটা ডিঙি বলা যায় সেটাকে। এ নৌকো দুহাজারমণী। নি-নি-করা গাঙে এর যাতায়াত। খালটার অর্ধেক জুড়ে বসে রয়েছে। যাচ্ছেও গদাই লস্করী চালে। অথচ জোয়ারের টানে চলেছে, আর জোয়ারটাও কম-জোরী নয়। এমনি করে চললে মাঝপথ যেতেই তো ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। ভূষণ অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল।

নৌকোটাকে যেন মজা পেয়ে বসেছে। খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ভূষণকে।

বোকা মাস্টারমশাইকে পেয়ে চালাক ছাত্র যাচ্ছেতাই ভুলভাল পড়ে যাচ্ছে যেন। হাল ঠিক রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ভূষণ। তবু নৌকোর টাল-মাটাল অবস্থা। ভূষণকে কড়মড় শব্দ তুলে ধমক দিতেদিতে একবার এদিক বাঁক নিচ্ছে, একবার ওদিক। ঘাম ছুটে যাচ্ছে ভূষণের।

'খচ্চর, শুওর।' হালের কান ধরে যথাশক্তি মোচড় দিতেদিতে গজগজ করে উঠল ভূষণ। নৌকোটাকে গাল পাড়ল। তার মনে হল নৌকোটা ইচ্ছে করে তাকে বেগ দিচ্ছে; পাজী বলদ যেমন লাঙলের মানুষ পাল্টালে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়তে চড়তে চায় না, নৌকোটা তার সঙ্গে তেমনি আচরণ জুড়ে দিয়েছে। 'যেমন শালা জোয়ারদার, তেমনি তার নৌকো।' হালটাকে বাঁ পাশে প্রচণ্ড একটা ঠ্যালা দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি পার করে দিল নৌকোটকে।

ঝপাৎ করে কোথায় যেন শব্দ হল। কেউ জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মনে হল। ভূগণের হাত কেঁপে উঠল হালের ওপর। চমকে উঠে ব্যাকুল উদ্বেগে চারদিকে নজর নিক্ষেপ করল। মনের ভুল নিশ্চয় নয়, কিন্তু এ কারো জলে ঝাঁপ দেবার শব্দও নয়। মালবওয়া নৌকোয় দু বছর কাজ করে জলের সমস্ত রকম শব্দের তফাৎ বুঝতে পারে ভূষণ। কোনটা ঘূর্ণির শব্দ, কোনটা সাঁতারের শব্দ, কোনটা ঝাঁপ দিয়ে পড়ার শব্দ, মাটি ধ্বসার শব্দ, কিংবা মাছ ঘাই দেওয়ার আওয়াজ, সব বুঝতে পারে ভূষণ। এটা পাড় থেকে মাটির চাঙড় খসে পড়ার শব্দ, বুঝতে পারল সে। তাই বলে নিশ্চিন্ত বা অসতর্ক হল না। করণ এই পীচের মতো আঁধার জলে গা ভাসিয়ে তারই মতো কেউ যদি এসে পড়ে, একজনের বেশী যদি এসে পড়ে, সামাল দেওয়া খুবই শক্ত হবে।

যেখানে বসে আছে ভূষণ ঠিক তার নিচেই ঘরখানার মধ্যে জোয়ারদারের আগলদার বাঁধা পড়ে আছে। কোন সাড়াশব্দ করছে না লোকটা। যেরকম শক্ত বাঁধন দেওয়া হয়েছে বাছাধনকে নড়াচড়া করতে হবে না। চ্যাচানির পথও বন্ধ। তাই বলে চুপচাপ শুয়ে আছে কি? যদি বাঁধন কোনরকমে ছিঁড়ে ফেলে? অবস্থাটা একবার দেখে আসতে পারলে হত। কিন্তু ঠাঁই ছেড়ে নামবার কোন উপায়ই যে নেই। ভূষণ ভাবনাটাকে আমল না দেবার চেষ্টা করল।

খালের পাড় ধরে দুপাশে বরাবর বাবলা পিটুনি আর অশথ-বটের ঘন সারি চলে গিয়েছে। গাছগুলো তেমন ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, কিন্তু পুঞ্জীভূত অন্ধকার

এসে ওদের একাকার করে দিয়েছে। ওদেরই কোন অলক্ষ্য কোণ থেকে যদি একঝাঁক সড়কি-বল্লম ছুটে আসে ঘরের চাল লক্ষ্য করে? আর তার যে কোন একটাই যদি এসে বিঁধে যায় তো এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে ভূষণ। জোয়ারদারের লেঠেলগুলোর কিছু কিছু গুণপনার সঙ্গে পরিচিত ভূষণ। ওদের সড়কি-বল্লমের ফলাগুলো যেমন তীক্ষ্ণ আর ধারাল, তেমনি লক্ষ্যও ওদের অব্যর্থ। অন্ধকার বলে যদি টিপ ফসকে যায়, এই একমাত্র সান্ত্বনা।

না, আর ভাবতে পারে না ভূষণ। মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরটা হাঁইপাই করেছে। আঁকুপাকু করছে। কপালের শিরাগুলো টনটনিয়ে উঠেছে। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো এখুনি যেন সেগুলো পটপট করে ছিঁড়ে যাবে। হাতের পেশীতে রক্ত জমে গিয়েছে, মনে হচ্ছে।

সামনেই বাঁ হাতে একটা শ্মশান। ভূতের মতো একটা বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে শ্মশানের মধ্যে। তলায় কালকাসুন্দের ঝোপ। ঝোপের মধ্য থেকে একটা খসখস শব্দ ভেসে এল। না, ভয় করবার কিছু নেই। গোটা চার পাঁচ শেয়াল নাড়াচাড়া করছে। মানুষ থাকলে অত কাছাকাছি শেয়াল থাককনা। মাটি খুঁড়ে মড়া তুলছে। ভূষণের মনে পড়ল আজ সকালেই হাড়িদের বছর পাঁচেকের একটা ছেলে মরেছে। অনাহারেই মারা গেছে। ছেলেটাকে কালকাসুন্দের ঝোপের পাশে মাটি দেওয়া হয়েছে। ওর বাপটাও মরতে বসেছে পেটের জ্বালায়, ভূষণ জানে। ভূষণ কাতরভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কোথা থেকে একটা সোরগোল ভেসে আসছে না? হ্যাঁ, তাই বটে। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে মিলিত কণ্ঠের হৈ চৈ ভেসে আসছে। ভূষণ শব্দের দিকে মনোযোগী কান পাতল। ঠিকই হয়েছে। চাষীরা ক্ষেত থেকে বুনো-শুওর তাড়াচ্ছে। অনেকটা দূরে মাঠের মধ্যে কয়েকটা আলোর আভাস। আলো জ্বালিয়ে চীৎকার করে শুওর তাড়াচ্ছে ক্ষেতে পাহারাদাররা।

আকাশের দিকে অকারণ তাকাল ভূষণ। অসংখ্য নক্ষত্র ফুটেছে। রাশী-কৃত ঘাসফুল ফুটে আছে যেন মাঠে। নক্ষত্র দেখে প্রহর নির্ণয় করতে পারল না সে।

এইমাত্র খালেক সাহেবের খটি পেরোল নৌকো। এইটিই গ্রামের সীমান্ত। এরপর জেলে পাড়া ফেলে পোয়াটাক পথ পুবমুখে এগোলে গাইঘাটার

মোহনা। খটির পর থেকে শ দুই গজ খালের দুধারে বরাবর নিবিড় বাঁশবন। লম্বা বাঁশের ডগলাগুলো দুধারে ঝেঁপে আসায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিবিড় অন্ধকারের ভীড়। ভূষণের শ্বাপদ-চক্ষুও এর মধ্যে দিশাহারা হয়ে পড়ল। নৌকোর হাল, এমনকি নিজের শরীর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে। এই জায়গাটাকেই সব থেকে ভয়। হঠাৎ-হঠাৎ গায়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা হয় না। রাতপাখীর ডাক, হাওয়ার দাপাদাপিতে বাঁশের গা শিরশির করা ধ্বনি, পাতা ঝরার খসখস শব্দ—সব মিলিয়ে বিচিত্র রাত্রির বাঁশবন। মাঝরাত যেন তার সন্তান-সন্ততি নাতিপুতি নিয়ে বাঁশবনের মধ্যে রীতিমতো একটা সংসার পাতিয়ে বসেছে। ভূষণ শরীরের সমস্ত ধমনীর রক্ত চলাচল রুখে দিয়ে শব হয়ে বসে রইল।

দেখতে দেখতে নৌকো প্রায় বাঁশবন পেরিয়ে এল। রাতচরা ভূষণ জলের মতো মাটির মধ্যেও সমস্ত রকম শব্দের তারতম্য বুঝতে পারে। মনটা কেমন কু গাইছে। বিপদের ঘ্রাণ পেয়ে বুকের ভেতরটা আথালি-পাথালি করছে। বাঁশবনের সুরু থেকে একটা দ্রুত অথচ নিঃশব্দ সঞ্চরণের শব্দ বরাবর অনুসরণ করে আসছে তাকে। শব্দটা বাঁশের পাতা ঝারও শব্দ নয়, পাখীর গলারও নয়। গিরগিটির মতো পা টিপেটিপে কারা যেন চলে বেড়াচ্ছে। আবছা মানুষের গলাও একবার শুনতে পেয়েছে সে। তাই যদি হবে, ভূষণ ভাববার চেষ্টা করল, এমন মওকা পেয়েও ওরা চড়াও হচ্ছে না কেন? এমনও হতে পারে, ভূষণ বোঝাবার চেষ্টা করল নিজেকে, এখানে যেমন আক্রমণের সুবিধে আছে, সে সুযোগ হয়তো ওরা দিতে নারাজ।

বাঁশবন পার হয়ে, গাঁয়ের জল নিকাশী পুল ডাইনে রেখে জেলেপাড়ার কাছে বাঁক ঘুরল নৌকো। দইঘাটার হদিশ এখান থেকেই মেলে। বড় জোর তিন শ গজ। কিংবা তারও কম। এখানে চর কিছু বিস্তৃত বলে গাছ-গাছালির জটলা কিঞ্চিৎ হাল্কা। মাথার ওপর অনেকখানি আকাশ। অন্ধকারও তেমন বুকচাপা নয়। কোম্পানীর বাঁধের ওপর বেলতলায় বসে এতরাতেও পাগলা কাঙাল জেলে গুণগুণ করে গান গাইছে। লোকটার ভয়ডর বলে কিছু নেই। পাগলের আবার ভয়? এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল ভূষণের।

ভূষণ শব্দ করে হাসল না বটে, কিন্তু হঠাৎই ভয়টা চলে গেল তার। নিতান্ত হয়ে উঠল সে। বেশ খোলামেলা বোধ করল নিজেকে। মধ্যরাত্রির গা জুড়োনো বাতাস এতক্ষণ পরে শরীরে কাজ করল তার। বুকটা আর তেমন

ধানাই-প্যানাই করছে না। গিরগিটির হাঁটার মতো নিঃশব্দ পায়ের সঞ্চরণও কখন যেন থেমে গেছে। খাল এখানে কিছুটা নাব্য বলে নৌকোর গতিও খানিকটা দ্রুত। কেমন একটা নিশ্চিন্ততার আবেশে চোখ বুজে ফেলল ভূষণ।

আবিষ্ট হয়ে কতক্ষণ ভূষণ ছিল মনে নেই, হঠাৎ চমকে চোখ মেলল সে। সামনে না পেছনে, কোনখানে ঠিক নেই, খালের একদিকের পাড় যেন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। অসংখ্য বোয়াল আর ভেটকি লাফ কাটতে সুরু করে দিয়েছে যেন কোথাও। কিন্তু শব্দটা থামছে না তো! কলকল ছলছল আওয়াজ তুলে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে এগিয়েই আসছে ক্রমশঃ। ভূষণের গলার কাছে একটা চীৎকার এসে থতমত খেল। ভূষণ কি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল?

খালের মধ্যে নৌকোটা ঘুরপাক সুরু করে দিয়েছে। হালের ওপর থেকে কখন হাতটা খসে পড়েছে ভূষণের। শ্বাপদ চোখের আঁধারভেদী চাউনি ভিজে কাঠের মতো চুপসে গেছে। ভূষণ কোনখানে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বুকের ভেতরকার এক উদভ্রান্ত।

নৌকোর গায়ে একসঙ্গে অনেকগুলো ঢেউ আছড়ে পড়ল ধুপধাপ শব্দ। দুহাজারমণী নায়ের বিশাল শরীরটা দুলে উঠল একবার। কয়েকটা জমাট অন্ধকারমাখা ছায়া। বিদ্যুৎচমকের মতো ডান কোমরে আঁটা ছোরাটা ঝলসে উঠল ভূষণের চোখে।

আঁধারমাখা ছায়াগুলো আর কিছু নয়, জোয়ারদারের প্রতিহিংসা। না ভূষণের সেটা বুঝতে দেরি হল না।

প্রথম ঘাটা মাথা ঘষটে কাঁধের ওপর পড়ছে। কাঁধের খানিকটা হয়তো থেঁতো হয়েই গেল। ভূষণের মুখ থেকে একটা গোঙানি বের হয়ে এল। সেও ছাড়েনি। ছোরাখানা পাঁজরের উপর সজোরেই পড়েছে। লোকটা নৌকোর পাটাতনে চালের বস্তার ওপর কাটা পাঁঠার মতো তড়পাচ্ছে। কিন্তু ছোরাটা পাঁজরেই রয়ে গেছে, খুলে নিতে পারেনি ভূষণ। গায়ের জোরেই টেনেছিল সে, কিন্তু পাথরে গেঁথেছে যেন। ভূষণের হাতে গরম রক্ত।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ভূষণ। ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারলে এখন প্রাণটা বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু সারা শরীরে যেন পক্ষাঘাত। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যাবার চেষ্টা করল সে, আবার একটা লাঠির ঘা, পাছার ওপর। মুখ থুবড়ে পড়ল ভূষণ। শরীরটা হালের কাছে ঘরের গড়ানের

ওপর উল্টোমুখে ঝুলতে থাকল, আর ঝুলন্ত মুখ থেকে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সুদীর্ঘ আ—আ—আ—ধ্বনি, যন্ত্রনার্ত গোঙানি বেরিয়ে এল। খালের জলস্রোত ছুঁয়ে গোঙানিটা কাঁপতে কাঁপতে ছুটল।

'আর একটু হলেই শালা পালিয়েছিল। খুব জোর সময়ে এসে পড়া গেছে।' অন্ধকারের মধ্যে কে বলে উঠল।

'আমাদের একটাকে তো নিয়েইছে, ও শুওরবাচ্ছাকেও খতম করে দে।' দাঁত দিয়ে কড়াই ভাঙছে যেন লোকটা।

মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। কপাল চুল ভেসে গেছে ঘন আঠালো রক্তে। ভূষণ যেন ডুবে যাচ্ছে এক অনুভূতিশূন্যতার মধ্যে। সেই অবস্থার মধ্যেই আর একটা চোট খেল সে। এবার একেবারে সরাসরি মাথায়। ভূষণের ঝুলন্ত শরীরটা জলে টুপ করে খসে পড়ল। জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে ভূষণ। চেতনা তখন তার শূন্যতার চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। অনেক দূরে আবছা একটু আলোর আভাসের মতো ভূষণের মনে হল। গাইঘাটার মোহনা থেকে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটা হল্লা ছুটে আসছে। ওরা বোধ হয় টের পেয়েছে, যাদের অপেক্ষায় এতখানি পথ সে নৌকোটাকে টেনে এনেছে। চৈতন্যের শেষ আলোকবিন্দুটা সম্পূর্ণ মুছে যাবার আগে ভূষণ মনে করতে পারল তার গোঙানিটা ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছে।

নামিপদের পোশাক

মুনশি খগরাজ

কেজোপদের পোশাক আর নামি পদের পোশাক এক নয়। তবে পোশাক ছাড়াও কোন কোন ধাতু সরাসরি নামি পদের কাজ করে। নমুনা—

ডাক দাগ ছুট সাজ জিত ফল ধস মার টান ভিড় চাপ ঘুর ঘাম ওহাক রাগ লুট মিল কাস হার বেড় ছাপ ছাট খেল মিশ ধার মাশ শাপ জপ তুল দুল ঝুল

কোন কোন ধাতু একটুখানি স্বর বদলে নামিপদে চলে আসে—

ভোগ > ভুগ, জোড় > জুড়, পোশ > পুশ, ওখোজ > ওখুজ, শোধ > শুধ
মোড় > মুড়, দোস > দুস, জোট > জুট, ওগোজ > ওগুজ

এবার কি কি পোশাকে ধাতু নামিপদে আসে তার হিশেবটা একটু দেখি—

(১) 'আ' পোশাকে—শোনা, বোনা, চেন, বেচা, কেনা, বসা, গড়া, চলা, কাটা, খাওআ, পাওয়া

(২) 'আই' পোশাকে—বাছাই, ঢালাই, ডলাই, মলাই, ঝাড়াই, লড়াই, পচাই, চড়াই,

(৩) 'আও' পোশাকে—চড়াও, ঘেরাও, ঢালাও, ফলাও,

(৪) 'ইএ' পোশাকে—গাইএ, খাইএ, নাচিএ, পড়িয়ে, লড়িএ,

(৫) 'উ' পোশাকে—ঢালু, চালু,

(৬) 'উআ' পোশাকে—পড়ুআ, লড়ুআ,

(৭) 'অক' পোশাকে—চালক, পালক, ঘটক, চড়ক, দোলক, মোড়ক, জোটক, জমক,

(৮) 'অট' পোশাকে—বুনট, চাপট

(৯) 'অন' পোশাকে—মরন, গড়ন, ভজন, চলন, মাজন, ভাঙন, পচন, ঝাড়ন, ওবাধন,

(১০) 'অস' পোশাকে—খোলস,

(১১) 'আট' পোশাকে—জমাট, ভরাট,

(১২) 'আন' পোশাকে—জানান, হেলান, চালান, চটান, ছাড়ান, কাটান, চাপান, ভোগান, ভাসান, ডোবান, ঠকান, গছান, ওকাদান, বকান, মানান, ঠেসান, খসান, খাটান, জপান, ঘোরান, বানান,

(১৩) 'আনো' পোশাকে—জানানো, ঘোরানো, ছাড়ানো, বানানো,

(১৩ক) 'আনি' পোশাকে—শুনানি, শাসানি, ভাঙানি, ঢলানি, ওচেচানি, চুবানি,

(১৪) 'আল' পোশাকে—মাতাল,

(১৪ক) 'আলো' পোশাকে—ঘুরালো

(১৫) 'উক' পোশাকে—ভাবুক, মিশুক,

(১৬) 'উনি' পোশাকে—চালুনি, খাটুনি, ওকাছুনি, ওরাধুনি, চিরুনি, বকনি, ঢুলুনি.

(১৭) 'উরি' পোশাকে—ডুবুরি, ধুমুরি, ফুলুরি,

(১৮) 'তা' পোশাকে—পড়তা, ফেরতা, করতা,

(১৯) 'তি' পোশাকে—কাটতি, কমতি, ঝরতি, পড়তি, উঠতি, ভরতি,

(২০) 'তাই' পোশাকে—খোলতাই, ধরতাই,

(২১) 'না' পোশাকে—ফেলনা, খেলনা, বাজনা, ঝরনা, ভাবনা, ওরাধনা (ওরাননা), বাটনা, ঢাকনা,

(২২) 'নি' পোশাকে—ছাকনি, ঢাকনি, ওরাধনি, (ওরাননি)

(২৩) 'বার' পোশাকে—খাবার,

(২৪) 'ওআ' পোশাকে—লাগোআ, ওবাচোআ,

(২৫) 'অড়' পোশাকে—চাপড়,

(২৬) 'ই' „ —হাসি, কাশি,

পোশাক সব সময়ই ধাতুর পেছনে জোড়াই রেওয়াজ কিন্তু কখনো কখনো ধাতুর মানে পালটাতে বা জোর দিতে কোন কোন পোশাক আগেই জুড়ে দেআ হয়।—অচিন, অচল, অটুট, অমিল, অবুঝ, অনড়, অটল, অঝর, অমর, অবাধ, সটান, সজাগ,

বহু নামিপদ বাইরে থেকে বাঙলায় আমদানি হয়েছে সেই সংগে অনেক পোশাকও এসেছে। সেই সব পোশাক বা এক পদে একটি বা একটির বেশি পোশাক চাপিএ নতুন পদ বানান হয়।

(১) 'অক' পোশাকে—পাঠক, গোলক, মড়ক,
(২) 'অট' পোশাকে—দাপট,
(৩) 'অর' পোশাকে—ঙকাসর
(৪) 'অল' পোশাকে—হাতল, ধুমল, ধকল,
(৫) 'অশ' পোশাকে—লোমশ, মুখশ, ডাঙশ,
(৬) 'আ' পোশাকে—পাগলা, হাতা, রোগা হাজিরা, বাদলা, জলা, ঝালা
(৭) 'আই' পোশাকে—ঝালাই, সদাই, ননদাই,
(৮) 'আচি' পোশাকে—বেঙাচি, ঘামাচি,
(৯) 'আনা' পোশাকে—নজরানা, গরিবানা, বিবিআনা. সা৷লআনা, মালিকানা, মুনশিআনা,
(১০) 'আনি' পোশাকে—তলানি, পারানি, ভেঙচানি, কামড়ানি, নাকানি, ধমকানি,
(১১) 'আল' পোশাকে—ঙদাতাল, শিঙাল
(১২) 'আলা' পোশাকে—গোআলা, শদরালা
(১৩) 'আলি' পোশাকে—ফকিরালি, ভাটিআলি, গোড়ালি, মিশাল, মিতালি
(১৪) 'আরি' পোশাকে—ঙশাখারি ঙকাসারি, মাঝারি, কাটারি
(১৫) 'আড়ি' পোকাকে—বালুআড়ি,
(১৬) 'আমি' পোশাকে—পাকামি ঘরামি, পাগলামি, ফাজলামি, ইতরামি, ঙবাদরামি,
(১৭) 'ই' " —দোকানি, চাকরি, দালালি, তেলি, ঢুলি, ফাকি, চালাকি, ফাশি,
(১৮) 'ইআ' " —সবজে, হলদে, খাটিআ, দেড়ে,
(১৯) 'ইন' " —রঙিন, গাভিন,
(২০) 'ইমা' " —লালিমা, কালিমা,
(২১) 'ইনি' " —ঙচাদিনি, রঙিনি,
(২২) 'ইলা' " —রঙিলা,
(২৩) 'উ' " —ঙসাতারু,
(২৪) 'উক' " —লাজুক, পেটুক, চুমুক,

(২৫) 'উলি' „ —আধুলি. নিছুলি, গুহাস্থলি, বাড়িউলি,

(২৬) 'উরে' „ —হাটুরে কাঠুরে,

(২৭) 'উড়ে „ —সাপুড়ে, ফাগুড়ে, হাতুড়ে, ভুতুড়ে, খেলুড়ে,

(২৮) 'উড়ি' „ —হাতুড়ি

(২৯) 'উড়' „ —লেজুড়

(৩০) 'উআ' „ —ধেনো, টেকো, মেসো,

(৩১) 'এল' „ —ঘায়েল, ফুলেল, লেঠেল, গুগেজেল, গুসিদেল,

(৩২) 'ওআর' „ —জানোআর, খেলোআর,

(৩৩) 'ওআন' „ —দারোআন, গাড়োআল

(৩৪) 'ওআলা' „ —দাড়িওআলা, দইআলা, পাহারাওআলা, বইওআলা ফিরিওআলা,

(৩৫) 'কি' পোশাকে—ফুলকি, ডুলকি, হুমকি

(৩৬) 'কো' „ —কানকো, ফুলকো

(৩৭) 'কর' „ —বাজিকর, জাদুকর, রসুইকর, হালুইকর

(৩৮) 'কার' „ —পেশকার, গনতকার

(৩৯) 'কারি' „ —ফুলকারি, খোদকারি, ভিখারি (ভিখকারি)

(৪০) 'খানা' „ —জেলখানা, মুদিখানা, ছাপাখানা, কবরখানা, ডাকতারখানা, কশাইখানা, দফতরখানা, মুশাফির-খানা, তোশখানা, বারুদখানা

(৪১) 'খোর' „ —ঘুসখোর, নেশাখোর, গুলিখোর, চশমখোর, আফিঙখোর, সুদখোর, গুগাজাখোর

(৪২) 'গর' „ —কারিগর, সওদাগর, ওসতাগর

(৪৩) 'গার' „ —রোজগার, খিদমতগার

(৪৪) 'গি' „ —রাজগি, মাগগি

(৪৫) 'গিরি' „ —বাবুগিরি, কুলিগিরি, দারোগাগিরি. কেরানিগিরি, মুটেগিরি

(৪৬) 'চি' „ —তবলচি, মশালচি

(৪৭) 'চে' „ —লালচে, কালচে

(৪৮) 'জাদা' „ —নবাবজাদা, নামজাদা, শাহাজাদা, হারামজাদা

(৪৯) 'জাদি' „ —নবাবজাদি, শাহজাদি, হারামজাদি

(৫০) 'টে' 　„ —ঘোলাটে, খেপাটে, ঝগড়াটে, ভাড়াটে, কশটে, ডআশটে, ডধোআটে, লমবাটে

(৫১) 'তা' 　„ —নোনতা, রাঙতা, পানতা

(৫২) 'তি' 　„ —শালতি, চাকতি, ঘাটতি, গুলতি, জালতি, বরসাতি

(৫৩) 'তুমি' 　„ —ডগোআরতুমি

(৫৪) 'দার' 　„ —দোকানদার, পাওনাদার, খরিদদার, বখরাদার, মজুতদার, আড়তদার, জোতদার, দিলদার, মজাদার, সমঝদার, ফুলদার, খবরদার

(৫৫) 'দাড়ি' 　„ —দোকানদারি, আড়তদারি, খবরদারি

(৫৬) 'দানি' 　„ —ফুলদানি, পিকদানি, জলদানি, আতরদানি

(৫৭) 'দিহি' 　„ —জবাবদিহি, নিশানদিহি

(৫৮) 'পনা' 　„ —পাকাপনা, গিননিপনা, বুড়োপনা, হেঙলাপনা, নেকপনা

(৫৯) 'পানা' পোশাকে—রোগাপানা, মোটাপানা, হেঙলাপানা

(৬০) 'বাজ' 　„ —ধাপপাবাজ, রকবাজ, মামলাবাজ, মতলববাজ, ফেরেববাজ, ধড়িবাজ, ফাকিবাজ,

(৬১) 'বাজি' 　„ —গলবাজি, ফাকিবাজি, ধাপপাবাজি, ডিকবাজি, ভোজবাজি

(৬২) 'বান' 　„ —মেহেরবান

(৬৩) 'বানি' 　„ —মেহেরবানি

(৬৪) 'মি' 　„ —ছেলেমি, নেঙরামি, জেঠামি

(৬৫) 'লা' 　„ —পাতলা, মেঘলা, চাকলা, ছাতলা, একলা

(৬৬) 'লি' 　„ —সোনালি, রুপোলি,

(৬৭) 'ড়া' 　„ —রাজড়া, গাছড়া,

(৬৮) 'ড়ে' 　„ —চাসাড়ে, বাসাড়ে

(৬৯) 'সা' 　„ —ফলসা, ঝাপসা,মাকড়সা, ভাপসা

(৭০) 'সে' 　„ —পানসে, ফেকাসে, কটাসে

(৭১) 'সই' 　„ —টিপসই, মানানসই, মাপসই, জুতসই

(৭২) 'শাল' 　„ —হাতিশাল, ঘোড়াশাল, টাকশাল, ডঢেকিশাল,

(৭৩) 'শালা' " —পাঠশালা, গোশালা, কামারশালা, ধরমশালা

(৭৪) 'রু' " —ডসাতারু, বোমারু

এবারে পদের গোড়ায় কি কি পোশাক জোড়া হয় একটু হিসেব নিলে হয়।

(১) 'অ' পোশাকে—অকাজ, অকাল, অবাক, অবিচার, অবেলা, অসময়, অতল, অবোধ, অরুচি

(২) 'আ' " —আকাল, আলুনি, আগাছা

(৩) 'অন' " —অনাহার, অনাদায়, অনাদর, অনাটন, অনিচছে

(৪) 'অনা' " —অনামুখো, অনাছিসটি

(৫) 'কু' " —কুদিন, কুকাজ, কুকথা, কুরুচি

(৬) 'গর' " —গরমিল, গরহাজির, গররাজি

(৭) 'দুর' " —দুরদিন, দুরনাম, দুরসময়

(৮) 'বি' " —বিদেশ, বিবশ, বিবাদ, বিপাক, ডবিভুই

(৯) 'বে' " —বেহুশ, বেহাত, বেনাম, বেআইন, বেগতিক, বেদখল, বেদম, বেঢপ, বেচাল, বেআড়া, বেখাপ, বেঠিক, বেহায়া, বেপরোআ, বেতার, বেহিশেব, বেতরিবত, বেকার,

(১০) 'নি' পোশাকে—নিখরচা, নিরোগ, নিথর, নিরস, নিটোল,

(১১) 'নির' " —নিরলোভ, নিরবিবাদ, নিরঝনঝাট,

(১২) 'না' " —নাখোশ, নাহক, নারাজ, নামনজুর, নালায়েক,

(১৩) নিম' " —নিমরাজি, নিমখুন,

(১৪) 'রাম' " —রামদা, রামছাগল, রামশিঙা,

(১৫) 'স' " —সচেতন, সরস, সঠিক, সতেজ

(১৬) 'সা' " —সাবালক, সামিল, সাজোআন

(১৭) 'সু' " —সুদিন, সুনাম, সুফস, সুকম, সুনজর, সুবোধ, সুজোগ

(১৮) 'হা' " —হাভাতে, হাঘরে, হাপুতি

নতুন পদ বানানো ছাড়াও নামিপদের কয়েকটি পোশাক আছে, সেগুলি হল ডআতাতি পোশাক। ডআতাতি পোশাক দুজাতের। দুটো নামিপদের ডআতাতে আর নামিপদ ও কেজোপদের ডআতাতে একই পোশাক চলে না।

নামিপদে ও নামিপদে ডআতাতের পোশাক—

(১) 'র' পোশাকে—ননির, চিনির, মনির, তুলির, ধনুর, মনুর, তালার, জুতোর, তুলোর

(২) 'এর 　„　—পানের, হাতের, বাতের, ধানের, পায়ের, মাছের, গাছের

একটু নজর রাখলেই দেখতে পাই পদে লেজের স্বর বজায় থাকলে 'র' নইলে 'এর' পোশাক পরে।

নামিপদে ও কেজোপদে ঙআতাতের পোশাক—

(১) 'এ' পোশাকে—ঘরে, জলে, ফুলে, ফলে, হাতে, নাকে, মুখে, গাছে

(২) 'তে' 　„　—বাড়িতে, চটিতে, ঙহাটুতে, চিরুনিতে, চাটুতে

(৩) 'য়' 　„　—খেলায়, ধুলোয়, মোজায়, মাথায়

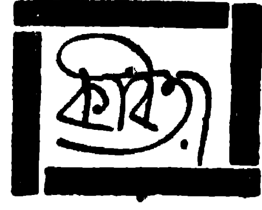
(৪) 'কে' 　„　—ননিকে, মধুকে, বাদলকে, শিলাকে

এখানে দেখতে পাই—লেজের স্বর না থাকা পদে 'এ' পোশাক—

লেজের স্বর—ই বা উ হলে 'তে' পোশাক

লেজের স্বর—আ বা ও হলে 'য়' পোশাক

কোনো লোকের নাম হলে—'কে' পোশাক।



জন্মকাল

শ্যামসুন্দর দে

সে দিন দুরন্ত জ্বালা পৃথিবীর বুকে
অসহ্য উত্তাপ আর আবর্তন—
আবর্তনের প্রবল ঘূর্ণিতে তখন
বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় জন্ম নিল
এক নতুন গ্রহ
যার দিকে চেয়ে চেয়ে শান্তি পেল
ম্লান হল যন্ত্রণার কাহিনী।

এখন আমরা এক যন্ত্রণার কালে।
যখন এক একটা মন
ক্রোধের তাপে উত্তপ্ত
সময়ের চেতনায় বিস্ফোরণের বাসনা
ক্রোধ আর যন্ত্রণায়
একটি নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি
যার আলোয় সে নিজেকে বাঁচাবে।

ফিরিয়ে দে

দীপেন রায়

ফিরিয়ে দে নৌকা-মাঝি-লোক-লস্কর
ময়না-টিয়া
ফিরে যাবো নগরে লৌকিকে ।
গাছের মধ্যে ভালোবাসার তোরই তো চোখ
ফেরানো আছে মূলে।
স্বেচ্ছাচারী রৌদ্রে আমার
ভালোলাগে না ঘর মজানো ছুটি ।
তেপান্তরের হাড় শুকোনো বাঁশী
সাজে না আর মাঠের মধ্যিখানে,
একলা পোষা নীলের বাহাদুরী
ছড়িয়ে পড়ে আতর মাখা মুখে ।

ফিরিয়ে দে জন্মদিনের গা আটকানো জামা
বুকের মধ্যে ছুটে যাবো,
ছড়ানো সংসারে
জলের মায়া তোরই তো হাত
উপুড় হ'য়ে ঝরে,
গাছের মধ্যে অজস্র তুই
নিজেই ভালোবাসা ।

দিনবদলের পূর্বাভাস

প্রভাত চৌধুরী

আমরা এবার পথে নেমেছি হাওয়া বদলে
সময় পাখি মুখ লুকিয়ে ডানা ঝাপ্টায়
দিনবদলের পূর্বাভাস
ক্ষেতের কিষাণ কলের মজুর যুক্ত আছি
যুক্ত আছি ছা-পোষা সব শহরবাসী

আর্তনাদে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘকাল রোদ সয়েছি
রোদের আঁচে পেট পুড়েছে
ছাঁচ ভেঙেছে ঘরের চালার
ঝড় দেখেছি গ্রামশহরে একইরকম কলখামারে

যুক্ত হলাম রোদের তাপে ঝড়ের ডাকে
পটের লক্ষ্মী ঘটের ঠাকুর শঙ্খ বাজাও
বরণডালায় সাত এয়োতি বরণ কর
দিনবদলের পূর্বাভাস
মাঝি এখন খুলতে পারো ঘাটের নাও।

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

(১)

এইমাত্র যে সমস্ত পথচারীদের মধ্যে দিয়ে তুমি এসেছ
তাঁদের মুখ মনে রেখ ;
বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষায় তোমার নিকটে যাঁরা দাঁড়িয়েছিল
তাঁদের মুখ মনে রেখ ;
আমার প্রবাস সময়ে যে সমস্ত ফুল ফুটে উঠবে
প্রিয় উদ্যানে,
তারা শুদ্ধ জ্ঞান এবং বিবেকের মতনই ধ্রুব,
যদি কাঁদতে হয় তাদের মুখ মনে রেখ।

(২)

মুঠোর মধ্যে ডালিমদানা ফেটে চৌচির দুঃখ নোংরাচ্ছে মার
গরদশাড়ী, মুখের হাসি দেখতে ব্যাকুল দিন ফুরোলে সোনাকাজল
আমার বাবার বুকের ভিতর আমারই ভিড়, সারাসময় আলতো রাখেন,
ক্রয়বাসনা সত্যিই ছিল গত শীতে গরমমোজা চেয়েছিলেন, হয়নি কেনা—
ভুল ভাঙলে ভুল, ব্যস্তবাগীশ তোমরা যখন ফিরিয়ে দিলে দুরন্ত সংসার,
উষ্ণ হাতে স্পর্শ করেন ডাক দিয়েছেন কোমলস্বরে···খোকা আমার খোকা

(৩)

বুকের মধ্যে স্রোতস্বিনী উথাল পাথাল প্রাণ পেয়েছে প্রতিমা
রণচণ্ডী ; হলুদপাখী বসছে এসে মণিবন্ধে সময়াবতার
কথা শুনুন, অরণ্যপথ আপনি চেনেন ! নাইবা হোল আলোকোজ্জ্বল,
হলুদপাখী বলবে কি সে অকস্মাৎ বসল কেন উড়ে এসে মণিবন্ধে,
বেশত ছিলাম গাঁয় গেরামে বন্যা প্লাবন ফসলভর কড়িখেলায়
সারা শরীরে নদী বইছে কে পুরোহিত প্রাণ পেয়েছে প্রতিমা রণচণ্ডী
সময়াবতার কি করি তার হলুদ পাখী বসল কেন···········

যাত্রার পূর্বে

আশিস সেনগুপ্ত

এ ভাবে দু পকেটে হাত গুঁজে
অবশ আঙুলগুলোকে আর
প্রশ্রয় দিওনা বন্ধু,
না, কোনো করমর্দন নয় কিম্বা বন্ধু সম্ভাষণ
অপরিচ্ছন্ন ঘেমো হাতে একটু মুক্ত বাতাসের
শীতলতা লাগুক ;

নিশ্চিত বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনতেই হবে :
সেই শীতলতা খেত সমাপ্ত পণ্যবাহী জাহাজকে
ভাসিয়ে দিয়ে নোনা ঢেউয়ের জলন্ত ফস্‌ফরাস্‌
যে উত্তাপের জন্ম, তা এই চার চৌক নগরীর গর্ভে
বন্দরে ভীড়বে। 'ভাসমান' 'ভাসমান' ডাক ছাড়ার মত
দিক্‌বিদিকে সময়াভাব

তুমি দিগন্ত নাবিক, দূরবীক্ষণে
অবুঝ অসহিষ্ণু কিম্বা ক্লান্ত হোয়ো না।
সবে অন্ধকার রাত অন্ধকার বুঝতে শিখেছে।

চলো, যাত্রার পুর্বে
কীচকের রক্ত মাংস আকণ্ঠ পান করে
সেই গুপ্ত ঘাতক অরণ্যে ফিরে যাই—
যেখানে বৃদ্ধ ঘোড়াদের মৃতদেহের উপর
সবুজ ঘাস আর সফেদ কাশ ফুলেরা
আনন্দে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে।

নতুন বই

বিষুবে রৌদ্রের ডালপালা [কাব্যগ্রন্থ]—তুলসী মুখোপাধ্যায় ॥
গ্রন্থজগৎ ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস কলকাতা-২৯ ॥
দাম : ছু টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার চেহারা এখন দ্রুত পালটে যাচ্ছে। পুরোনো শব্দব্যবহার, স্মৃতিচারণা এবং তার অনুষঙ্গে আর কেউ তেমন সন্তুষ্ট নয়। সকলেই চান ব্যক্তিহৃদয়ের উন্মোচন, স্বতন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গী ও সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবিতাকে নিজস্ব নির্মাণকৌশলে প্রতিষ্ঠিত করতে।

তুলসী মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখছেন এই মননশীলতার পরিমণ্ডলে। তাঁর কবিতা কিছুটা প্রথাভঙ্গের এবং প্রতিবাদের কিছুটা ধ্বংসের এবং পুনর্নির্মাণের।

অবশ্য এখানে 'ধ্বংস' শব্দটি আমি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করতে চাই না, গূঢ়তর অর্থেই তা ইঙ্গিতময়। কবিতার পুরোণো ছাদ ভেঙে দিয়ে পটভূমি তিনি তৈরী করতে চান বলে আমার বিশ্বাস। পূর্বজদের কাছ থেকে অনেক ধ্যানধারণা গ্রহণ করেও তিনি কথা বলেন নতুন কণ্ঠস্বরে। হৃদয় এবং উপলব্ধির উদ্ঘাটন প্রয়াসে তাঁর কবিতা অনেক বেশী আন্তরিক ও অকৃত্রিম। নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই তিনি সমকালীন মানুষ ও পৃথিবীকে উপলব্ধি করেন বুকের মধ্যে।

'আত্মপ্রতিকৃতি' কবিতার প্রথম স্তবকে তিনি লিখেছেন : "নিজেকে দেখার মতো অতি বড়ো অভিমান / অদ্যাবধি পৃথিবী চাক্ষুষ করেনি। / নিজেকে চেনার মতো দ্বিতীয় যন্ত্রণা কোনো / বেদ ও পুরাণে লেখা নেই। / আত্মপ্রতিকৃতির মতো ভয়ঙ্কর ক্রুশকাঠি / কোনো দক্ষ মিস্ত্রীর হাতে এখনো আসেনি।"

গদ্যের কর্কশতা তাঁর কবিতার অবয়ব নির্মাণে একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অপ্রচলিত এবং অতি-প্রচলিত কথ্যউচ্চারণের গতিময়তাকে তিনি আত্মস্থ করেছেন জীবন ও কবিতার যুগ্ম প্রয়োজনে। মাঝে মাঝে তিনি

নিজের ছলনাকে আবিষ্কার করে যেন নিজের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েছেন। আসলে, তিনি বুঝতে পেরেছেন নিজেকে চিনতে না পারলে অন্যকে চেনাও সম্ভব নয়। সেজন্যই তিনি একটি দর্পণের খোঁজ করেন, যেখানে তার ছায়া পড়বে অকৃত্রিম নগ্নতায়। আত্মপ্রতিকৃতির শেষ স্তবকে তাই তিনি ঘোষণা করেন; "নিজেকে দেখার মতো অদ্বিতীয় অভিযান / অদ্যাবধি পৃথিবী চাক্ষুষ করেনি।"

অনেক দুঃখের মুহূর্তে তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর ছেলেবেলার সময়কে। কয়েকটি কবিতায় বাল্য-কৈশোরের দিনগুলি অম্লান ও উজ্জ্বলতার রঙে চিত্রিত।

হয়তো তাঁর তীক্ষ্ণ সামাজিকতা বোধ এবং আত্মসচেতনতাই তাঁকে মানুষের অন্ধকার দিকগুলি সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হতে সাহায্য করেছে। মুখোসের অন্তরালে যে সত্য-মানুষের অবস্থান তাকেই তিনি খুঁজে পেতে চান।

তাঁর কবিতার মৌলপ্রত্যয়ে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থেকেছে এই আত্মানুসন্ধানের মনোভাব, যা তার ব্যক্তিত্ব গঠনেরও প্রধান উপাদান। অতি পরিচিত ঘটনা এবং পথ চল্তি মানুষের আচমকা উক্তি তাঁর চিন্তা ও কাব্যবিবেককে বারবার উদ্বুদ্ধ করেছে। এ ধরণের কয়েকটি কবিতা হলো 'যাওয়া হয় না' 'প্রকৃত মানুষ থেকে' 'আপোষ! আপোষ!' 'বরং বেরিয়ে যাই' প্রভৃতি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কবিতাকে পছন্দ করি তাঁর স্বরস্বাতন্ত্র্য ও মানুষকে চেনার দুর্লভ দৃষ্টিশক্তির জন্য। আমি তাঁর কবিব্যক্তিত্বের জন্য উল্লাস বোধ করি।

বইটির ছাপা কবিতা পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। মাঝে মাঝে মুদ্রা প্রসাদ অমার্জনীয়। প্রচ্ছদ এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবো।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তুমি কান্না গতি বারুদ। শ্যাম রায়। জ্ঞান-তীর্থ। দাম তিন টাকা।
একটা গুলির শব্দে। বাসুদেব দেব। গ্রন্থ-নিলয়। দাম দু টাকা।

একথা আজ বিদগ্ধ পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন যে বর্তমান কাব্যসাহিত্য আজ এক প্রতিশ্রুতিময় পরীক্ষানিরীক্ষায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে।

অবশ্য এই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে গিয়ে কোনো কোনো কবি হয়তো কিছুটা ঢুর্বোধ্য হয়ে পড়েন। কিন্তু এই ঢুর্বোধ্যতাকেও মানিয়ে নেওয়া চলে, যদি উক্ত কবির রচনায় স্বাস্থ্যের সহজ পরিচয় পাওয়া যায়। আজকের কবিতায় বর্ণ, শব্দ, প্রচলিত ছক ভেঙেচুরে নানা রকম নিজস্ব উচ্চারণকে প্রতিষ্ঠা করায় এক চেষ্টা থাকছে। এ ছাড়া সামাজিক দায়িত্ববোধ আজকের' কবিতার আর একদিকের বৈশিষ্ট্য। অথচ দেখা যায় হাল আমলেরই অন্য এক কবিগোষ্ঠী কাব্যরচনায় সমাজচেতনার ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হেঁয়ালী ধরণের এক জাতীয় বিচিত্র ধূর্ত কবিতা (?) বিভিন্ন ব্যবসায়ী পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য-বাজারে প্রচার করে চলেছেন। জীবন, মানুষ এবং সমাজের অভাবে এঁদের কবিতা আজ পাঠকদের কাছ থেকে বহু দূরে সরে গেছে। আবার এটাও সত্যি যে, বহু তরুণ কবি তাঁদের একান্ত নিজস্বতায় স্বচ্ছ এবং সৎ কবিতা রচনায় বিশ্বাসী। স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলি একে।

আলোচ্য বই দুটির মধ্যে 'ভূমি কান্না গতি বারুদ'-এর কবি শ্যাম রায় রোমান্টিক। তাই বলে তিনি তাঁর পরিচিত জগত, পরিবেশ ও জীবনকে তুচ্ছ করে রোমান্সের তটিনী স্নানে ডুবে থাকেন নি—আর এইখানেই তাঁর সার্থকতা। কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। 'ভূমি' অংশে কবি রোমান্টিক হলেও সামাজিক দায়িত্ববোধকে পাশ কাটিয়ে যান নি; যেমন,

১। "ছায়া ছবির গোহালে রসিক-বাছুরের কিউ।"

২। "শব্দের প্যারাসুটে ঝোলাঝুলি সেরে গুহায় ফেরা,"

৩। "কাঁচুলির কলঙ্ক বন্ধন মুক্ত নিঃশ্বাসে"

৪। "রসিকতা ক'দিনের কথা? নিশুষ্ক বারুদই জীবন", ইত্যাদি।

শ্রীরায় স্বচ্ছ, সৎ কবিতা রচনায় বিশ্বাসী। আরো উদাহরণ দিই—"আমরা কি হিসেবের খাতাতে বাম থেকে একটু সরে এসেছি"......"সে রয়েছে পড়ে মহান শক্তির আশ্বাসে,"......"জঞ্জালের পাশে নেড়ী কুকুরটির সঙ্গে / সেই ভিক্ষুকটি যে অবশিষ্ট খাদ্য খোঁজে," ইত্যাদি। এ ছাড়া গলি থেকে ১৯৬৫, দপ্তর ও ঘর, ময়দান, ক্ষুদ্রের জোয়ার, অস্তিত্ব, মসৃণ অবতরণ এবং সিগ্‌নাল প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবি 'ধানু' শব্দটিকে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছেন। সবক্ষেত্রেই যে

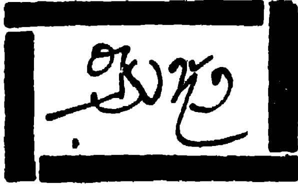
অভীষ্ট লক্ষ্যটি সার্থক হয়েছে তা নয়, তবে অনুভূতির সম্প্রসারণ ক্ষমতায় প্রায়ই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। কবি তাঁর সততা এবং স্পষ্ট বক্তব্যের জন্য যে সমাদর পাবেন, যে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

প্রেম এবং প্রকৃতির অনুভব প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে বাসুদেব দেবের কাব্যগ্রন্থ "একটা গুলির শব্দে"। বাসুদেব দেব মেজাজে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক কবি হলেও প্রায়শই মুক্তিকমুখীও হয়েছেন। সুন্দর রূপকল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা এক অতৃপ্ত স্মৃতির অন্বেষণে নিবেদিত। তাই এখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রেমজাত মিশ্র বেদনা কবির সমস্ত সত্তার অনুভূতি। বাসুদেব দেবের কবিতায় আবেগ গভীর থেকে উদ্ভূত সংযমবোধের পরিচয় রেখেছে। যেমন,

"দুঃখের বিচিত্র বর্ণে প্রেমিকের মুখচ্ছবি আঁকা," এবং "প্রতীক্ষায় আছি, সর্বদাই মনে হয়, অসন্তুষ্ট, লোভী," কিংবা "আমাকে দাও সেই সাবলীল ভেলা বেহুলা গো, রক্তে নাচে বিষ", ইত্যাদি।

আজকের দিনের কবির কাছে জগত, জীবন এবং জীবনের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সাধারণভাবে আমরা যে বলিষ্ঠতা আশা করি তা এই গ্রন্থে স্পষ্ট নয়। তবে কবির সামাজিক দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি একেবারে উদাসীন একথাও বলা যায় না—কারণ বর্তমান সামাজিক বিপর্যয়ের দিকে তিনি চোখ রেখেছেন। যেমন, "সভ্যতার শেষ অবধূত যাচ্ছে ঢাকা রাত্রির ফিটনে" এবং "একটা বুলেট বেচে আরো দেড় সের গম খরিদ করুন," কিংবা "টেরিলিনের ভাজ ভাঙে না—সভ্যতা খুব দুরন্ত" ইত্যাদি। এই পর্যায়ে—বন্ধুদের প্রতি, জতুগৃহ, অলৌকিক বীণা, মধ্যরাতের সংলাপ থেকে এবং একটা গুলি বিশেষ আকর্ষণ করে—অর্থাৎ, বাসুদেব দেব যে স্বচ্ছ এবং সৎ কবিতা রচনায় বিশ্বাসী কবিতাগুলি তারই প্রমাণ।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়



সাম্প্রতিক নাটক

অভিনয়-দর্পণে বলা হয়েছে—

"কীর্ত্তি প্রগল্‌ভ সৌভাগ্য বৈদগ্ধানাং প্রবর্ধনম্।

ঔদার্য্য স্থৈর্য্য ধৈর্য্যাণঞ্চ বিনাসস্তু চ কারণম॥"

আজকের মানসিকাতাও নাটকের অভিনয়ের জন্য উপরোক্ত কারণগুলিই নির্দিষ্ট করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলোচনা সমালোচনা অনেক হ'লেও বাংলা দেশে নাট্যকারেরা নাটক লেখার সময় বোধহয় উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখেন না।

নাটক দৃশ্যকাব্য ; অভিনয়ের ওপর তাকে অনেকটা নির্ভর করতে হয়। বহু তৃতীয় শ্রেণীর নাটক শুধু অভিনয়ের গুণে জনসমাজে বহুল আদৃত হয়েছে এমন নজির বাংলা দেশে আছে। আবার বহু সাহিত্য রসসমৃদ্ধ নাটক আজও সু-প্রযোজিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র বা যোগেশ চৌধুরীর নাটকগুলি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বর্তমানে বাংলা দেশে চলচ্চিত্রের পরই জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসাবে নাটকের স্থান। রেডিওর কল্যাণে সপ্তাহে যে চার পাঁচটি নাটক আমরা শুনি তার অধিকাংশই অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট। আর সেখানকার অভিনয়রীতিও সেকেলে, অনেক সময়ই হাস্যকর। ব্যতিক্রম মাঝেমধ্যে দেখা যায়। সম্প্রতি ঋত্বিক ঘটকের "জ্বালা" নাটকটি এর নিদর্শন।

এছাড়া আছে পেশাদার মঞ্চ। তার সব ক'টিই কোলকাতায়। (সম্প্রতি শালকিয়াতে একটি নূতন মঞ্চের উদ্বোধন অবশ্য হয়েছে)। এক মিনার্ভা ছাড়া এর কোনটিই গিরিশচন্দ্র বা শিশিরকুমারের অভিনয়রীতির বাইরে আজও বেরুতে পারেনি। যদিও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে চমক সৃষ্টি করার কৃতিত্ব এদের আছে। বক্তব্যহীন সামাজিক (!) নাটকই এঁরা সাধারণতঃ করেন। কৃতী অভিনেতার একক অভিনয়ই এঁদের মূলধন্।

একমাত্র মিনার্ভা থিয়েটারে একটি প্রতিষ্ঠিত অপেশাদার দল পেশাদারী ভিত্তিতে আঙ্গিক ও বক্তব্যবহুল নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছেন।

নাটকের ক্ষেত্রে যা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে, তার প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই অপেশাদার দলগুলির। ১৯৬৭ সালে প্রায় শতাধিক দল কোলকাতায় অন্ততঃ ১১৬টি নাটক মঞ্চস্থ করেছেনে ২৭টি দল। যে ১১৬টি নাটকের হিসাব আমাদের কাছে আছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত নাট্যকারদের নাটক আমরা পেয়েছি—রবীন্দ্রনাথ—৭টি; দ্বিজেন্দ্রলাল—১টি (একই নাটক দুইটি দল মঞ্চস্থ করেছেন); অমৃতলাল—২টি; আধুনিক কথাশিল্পীর গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ—৭টি; বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ—অন্ততঃ ১৪টি (তার বেশীরভাগই অবশ্য অনুবাদক কর্তৃক স্বীকৃত নয়)। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে শ্রীবাদল সরকারের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে দুটি আর শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ৬টি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য শ্রীসরকার ও শ্রীচট্টোপাধ্যায় উভয়ই এ্যাবসার্ড নাট্যকার হিসাবে খ্যাত।

এত নাটক মঞ্চস্থ হওয়া সত্বেও এটা ঘটনা যে মনে রাখবার মত যুগান্তর-কারী নাটক আজও বাংলা দেশে লেখা হয়নি, হওয়ার কোনও লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। মঞ্চস্থ হবার তো কোন প্রশ্নই আসেনা। প্রথম আবির্ভাবে দু'একজন যদিও বা কিছু চমক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু স্থায়ী কোন কীর্তি তাঁরা কেউই রাখতে পারেননি।

সবচেয়ে চিন্তার কারণ ঘটেছে ভাবানুবাদের হিড়িকে। তারও বেশির ভাবাই মূল নাটকের নাম উল্লেখ না করেই অনুবাদ। আগে ভাবতাম এটা বুঝি হিন্দি সিনেমারই একচেটিয়া। কিন্তু প্রথম শেরউডের 'পেট্রিফায়েড ফরেষ্ট' পড়ার পর জানলাম বাংলা নাটকেও এ কায়দা চলছে। আর তাই বাঘের নাট্যকার মারে সিস্‌গালের 'দি টাইগারের' কথাও বেমালুম চেপে যান। কিম্বা দ্বীপের নাট্যকার সিমনভ-এর 'দি ফোর্থ' এর কথা স্বীকারও করেন না। অথচ এই নাট্যকারের নিজের নাটকগুলি বিদেশে অভিনয়ের সময় তাঁরা মূল নাটকের কথা স্বীকার করেন। এবং ভাবানুবাদের ধার দিয়েও যান না। অনুবাদেই সন্তুষ্ট থাকেন। প্রশ্ন হ'ল, যদি গ্রীক নাটক গ্রীক পাত্রপাত্রীদের রেখে বা শেক্সপীয়ারের ওথেলো কি ম্যাকবেথ শুধু অনুবাদ করেই অভিনয় করা যায় তবে হঠাৎ আধুনিক নাটকের ভাবানুবাদের কি প্রয়োজন? মাদার তো আমরা রুশ দেশের পটভূমিকাতেই করি।

আর ওঁরাও শকুন্তলা কি মৃচ্ছকটিক এমন কি রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ভারতবর্ষের পটভূমিকাতেই মঞ্চস্থ করেন। একি শুধু কপিরাইটের জন্য? মূল নাট্যকারকে ফাঁকি দিতে অনুবাদকের চালাকি? সবচেয়ে মজার কথা, এই অনুবাদকেরা অনেকেই সারাজীবনে একটাও নাটক নিজে ভেবে লিখতে পারেননি; অথচ তাঁরা বাংলা দেশে নাট্যকার বলে স্বীকৃত।

অনেকে বলেন বিদেশী পাত্রপাত্রী নাকি বাংলা দেশের দর্শক এ্যাকসেপ্ট করবেন না। এটা তাঁদের কতটা তথ্যনির্ভর জানি না। কিন্তু আমরা দেখেছি বিদেশীরা শকুন্তলা বা নৌকাডুবিকে এ্যাকসেপ্ট করেন। এদেশের দর্শক রাজা অয়েদিপাউস বা ওথেলোকে এ্যাকসেপ্টই করেছেন। শুধু বেচারা চেখভ কি সিয়ান ও কেসী বা সার্ত্র কি দোষ করলেন? উইলিস হাল কি সিমনভেরা জানতেই পারলেন না তাঁদের নাটক বাংলা দেশে অভিনীত হয়ে হাততালি কুড়িয়ে চলে গেছে। প্রিষ্টলে, টেনেসি উইলিয়ামস কি আর্থার মিলার সবারই একদশা। এই উঞ্ছবৃত্তি কতদিন চলবে জানি না। আরও একটা ব্যাপার আছে যেটা শিল্পের দিক থেকে খুবই ক্ষতিকারক। সেটা হ'ল মূল নাটক লেখার সময় নাট্যকারকে যে পরিপার্শ্বিক বেছে নিতে হয় সেটা সবদেশে সমান নয়। সার্ত্র কনডেমড অব আলতোনা লেখেন জার্মানির পটভূমিকায়, কারণ ফ্রান্সে মনোপলি ক্যাপিটাল জার্মানির পর্যায়ে যায়নি। ফরাসী নাট্যকার যে ঘটনাকে ফ্রান্সের পটভূমিকায় নিতে পারেন নি সেটার বঙ্গীকরণ সত্যিই অক্ষম নয়, হাস্যকরও বটে। শিক্ষা তো আমরা বিদেশের ঘটনা থেকেও নিতে পারি। বাংলা দেশের পটভূমিকায় কেউতো ভিয়েতনামের যুদ্ধ দেখাতে বসেন না। বাংলা দেশের নাট্যকার, সমালোচক এমনকি দর্শকদেরও এই প্রশ্নগুলি ভেবে দেখা দরকার বলে বোধ হয়।

প্রদীপ্ত সেন

'মুক্তমেলা প্রসঙ্গে'

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকারের পথিকেরা সম্প্রতি নতুন এক খেলায় মেতেছেন। শনিবারের দুপুরে কোলকাতার ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যখন রেস্থুরেদের জুয়া-খেলা চলছে, এঁরা তখন ময়দানের নির্জনতায় মুক্তমেলার আসর সাজিয়ে যৌন-খেলায় উর্দ্ধবাহু তাণ্ডব শুরু করেছেন। এই বিকৃত মানসিকতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশের একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা-গোষ্ঠী—প্রচারের ঢাক এঁরাই কাঁধে নিয়ে লোক জড়ো করার প্রসাসে আপ্রাণ গলাবাজি করে চলেছেন। প্রতি শনিবার এই মেলায় যাঁরা চটকদার পশরা সাজাচ্ছেন তাঁরা বাংলাদেশের তথাকথিত সাহিত্য-সংস্কৃতির নাম-করা আর উঠ্‌তি-নামের সাহিত্যিক-শিল্পীর দল। এঁদের মধ্যে বিবর-বিলাসী সমরেশবাবুরা যেমন আছেন তেমনি আছেন মার্কসবাদী (!) কবি প্রৌঢ় সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আছেন ভারত-সরকারের সঙ্গীত নাটক একাদেমীর সভ্য 'বহুরূপী'-র মাননীয় শম্ভু মিত্র মশাই! জনৈক মার্কিনী ঢঙের চিত্রশিল্পী রংবেরঙের পোষাক পরে আদিম ক্ষুধার পটভূমিকায় মৃত্যু-মিছিল পরিচালনা করছেন। ভারত-বিখ্যাত একজন কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী প্রৌঢ়-কবির স্নেহচ্ছায়া মুক্তমেলার অঙ্গণে দীর্ঘায়িত এবং তস্য জামাতা এর প্রধান সংগঠক!

এইসব দেখে-শুনে সঙ্গতকারণেই বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ মুক্তমেলার যৌন-মহোৎসবের পিছনে সি-আই-এর কালোছায়ার অনুমান করছে। সমগ্র বাংলাদেশের কৃষকমজুর ও মধ্যবিত্ত সমাজ যখন আজ নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ভণ্ডামির জাল ছিন্ন করার জন্য যখন যুব-সমাজের লক্ষবাহু উর্ধে উৎক্ষিপ্ত, যখন শত-শহীদের রক্তে ভেজা বাংলার মাটিতে নতুন প্রাণের ফুল ফুটছে—তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়দানের নির্জনতায় প্রতিক্রিয়াশীল-চক্রান্তের এ কোন্ নতুন ফাঁদ রচনা? বুর্জোয়া শোষক-গোষ্ঠীর গোপন-নির্দেশে সংগ্রামী যুবশক্তিকে বিপথগামী করার জন্যই কি এরা মুক্তমেলার নামে যৌন-লীলার আসর সাজাতে বসেছে? আর এই জন্যই কি মহামান্য আমেরিকান কন্সাল মুক্তমেলার শরিক হয়ে এই বিবর-বিলাসীদের আশীর্বাদ জানিয়ে গেছেন! এই আশীর্বাদ একেবারেই নির্ভেজাল অথবা এর সঙ্গে ডলারের কোন গাঁটছড়া বাঁধা আছে কিনা কে বলবে!

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে, তার সাহিত্যে এবং চলচ্চিত্রে যৌনতার আসর এখন সরগরম। আমেরিকার রাস্তায় ঘাটে এখন টপলেস মনোহারিণীরা অবাধে সঞ্চারিত। হোটেলে-পার্কে সমুদ্রের তীরে এখন অবাধ যৌনলীলা। দিকে দিকে গড়ে উঠছে 'নুডিস্ট কলোনী'। সেই বিকৃত বীভৎস ইয়াঙ্কি কালচারের স্রোত এদেশে বইয়ে দেবার জন্ত অজস্র টাকা ঢালছে সি-আই-এ। আর তার সঙ্গে মদত দিচ্ছে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগোষ্ঠীর বুর্জোয়া মালিকেরা। 'মুক্তমেলা' সেই ইয়াঙ্কি কালচারেরই বাংলা অনাচার!

আশার কথা, বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ এই মেলার স্বরূপ চিনতে বিলম্ব করেন নি। ইতিমধ্যেই প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে আরম্ভ করেছে। হয়ত অনতি-কালের মধ্যেই এই প্রতিবাদ সক্রিয় প্রতিরোধের রূপ গ্রহণ করবে।

তপোবিজয় ঘোষ

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমাদর করে না, অনুশীলন করে না, এ-অপবাদ বহু-প্রচলিত। বাংলার জন-জীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত লোকসংগীত, কীর্তন, বাউল এবং রবীন্দ্র সংগীত প্রভৃতির অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক প্রসারের জন্য যদি এ-অপবাদ হয়ে থাকে তবে তাতে কোনো ক্ষতি আছে বলে মনে করি না কারণ বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যে-সংগীতের যোগ ক্ষীণ সেই উচ্চাঙ্গ সংগীত যদি সীমিত গোষ্ঠীতেই রুদ্ধ হয়ে থাকে তবে তাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না, বরং তা অধিকতর কাম্য। কিন্তু আসল কথা, সে-অপবাদ বিচারসহ নয়। কারণ, এই বাংলা দেশেই আমরা ধ্রুপদী সংগীতকলার প্রথম শ্রেণীর বহু শিল্পীদের প্রত্যক্ষ করেছি। সেই সার্থকনামা শিল্পীরা ভারতীয় সংগীতকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরই অন্যতম ধারাবাহী ছিলেন বিষ্ণুপুরের স্বনামখ্যাত সংগীত নায়ক, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র এবং তিনি বিষ্ণুপুরের ঐ সংগীতজ্ঞ পরিবারের আদর্শকে তাঁর নিষ্ঠা এবং সাধনায় বিশিষ্টতা দান করে গেছেন। গত ১৪ই জানুয়ারী তাঁর জীবনাবসানে এই সংগীত ধারায় একটা দীর্ঘচ্ছেদ পড়ল।

রমেশচন্দ্র মুখ্যত তাঁর পিতার কাছেই সংগীত শিক্ষা করেন। বিশেষ ভাবে শেখেন ধ্রুপদ ও খেয়াল, আর ভারত বিখ্যাত ধামার গায়ক বিশ্বনাথ রাওএর কাছে ধামার ও তিলানা' পদ্ধতি শিক্ষালাভ করেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতিটি বিভাগেই তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। ভক্তিমূলক সংগীত, বিশেষ করে ভজন ও পুরাতন বাংলা গানে তাঁর পারদর্শিতাও উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরাধিক কাল অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর শ্রদ্ধেয় শিল্পী হিসাবে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্‌পা ও ভজন গানে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেছেন।

রমেশচন্দ্রের অন্যতম প্রধান পরিচিতি ছিল উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সংগীতের নিষ্ঠাবান শিল্পী হিসাবে এবং সে সংগীতকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তাঁর দান অনন্ত। রবীন্দ্র সংগীতের উচ্চাঙ্গ ধারার সঙ্গে ক্লাসিক্যাল সংগীতের

স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচার ও প্রসারে যে প্রায় একক প্রচেষ্টা করে গেছেন তা সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে।

রমেশচন্দ্র নিজে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না বলে তিনি সঙ্গীত জগতের জাত বিচারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন সব সংগীতের মূল এক। তথাকথিত রাগ রাগিনীর মতভেদ ও বিভিন্ন শাস্ত্রমত সংগীতের, বহিরঙ্গ মাত্র, অন্তরঙ্গের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সংগীতের প্রাণের প্রশ্নে সব সংগীতই এক এবং অভিন্ন, সেখানে রসানুভূতি এবং রসসঞ্চারই মূল কথা।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার সাধনায় তিনি আজীবন ব্রতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনসাধারণ উচ্চাঙ্গ সংগীতকে একদিন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবে এবং তাঁরা সস্তা চটক-দারী সংগীতও একদিন বর্জন করবে।

বাংলা ও বাংলার বাইরের বহু পত্রপত্রিকায় সংগীত সম্বন্ধে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতেন। আমাদের পত্রিকারও তিনি একজন বহুমান্য লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বিষ্ণুপুর—দ্বিতীয় দিল্লী' 'গোপেশ্বর গীতিকা' এবং 'বাণীবীণা'।

পশ্চিম বাংলার সংগীত নাটক একাডেমির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি এর ফ্যাকালটি অব মিউজিকের ডীন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এর রূপান্তর হবার পরও তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ-পদ অলঙ্কৃত করেন।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়োগকে আমরা স্বজন-বিয়োগ বলে মনে করি এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী

কবিয়াল গুরুদাস পাল

কবিয়াল গুরুদাস পালের জীবনদীপ নির্বাপিত হল বিগত ১৩ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টায়। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বাংলার মুষ্টিমেয় কয়েকজন খ্যাতনামা কবিয়ালের একটি বিরাট স্থান শূন্য হল। বাংলা লোককলার এই প্রশাখায় আপন সৃষ্টি ও প্রতিভায় যাঁরা বাংলা দেশের অগণিত মানুষের মনের কন্দরে অম্লান আসন করে রেখেছিলেন গুরুদাস পাল ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

শুধুমাত্র কবিয়াল হিসাবেই তাঁর পরিচিতি বা খ্যাতি ছিল না, উপরন্তু লোককলার অন্যান্য অঙ্গ—জারী, তরজা, সারি, গাজী ইত্যাদি গানেও ছিল তাঁর দেশজোড়া খ্যাতি। কৃষ্ণবর্ণ, ছোট্ট এই অল্প আয়ের বিড়ি-শ্রমিক মানুষটি তাঁর জীবনের ৩১টি বছর নিরলস, নিরহঙ্কার ও জাত শিল্পীর মত অসংখ্য সৃষ্টিপ্রবাহে গ্রাম-নগর-প্রান্তরের লক্ষলক্ষ মানুষকে একদিকে যেমন সাঙ্গিতীক রস বিতরণ করেছেন তেমনি তাদের মহত্তর জীবন ভাবনায় উদ্দীপিত করেছেন। দলিত-নির্যাতিত, নিরন্ন শ্রমিক কৃষক নিম্ন আয়ের মানুষের হৃদয়ে তিনি কয়েকটি যুগ ধরে যুগেরবন্ধন, নির্যাতন, শোষণ ইত্যাদির চিত্র তুলে ধরেছেন। নিরাশ, হতচিত্ত রিক্ত মানুষকে দ্রুততালে মহতী জীবন, দর্শন, সমাজ ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্থির, চৈতন্য ছিল স্বচ্ছ, এবং কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে ছিল প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস। আর সেই কারণেই গণশিল্পীর যতগুলি যোগ্যতা ও গুণ—তা তাঁর আয়ত্তে ছিল। সেই কারণেই তাঁকে দেখা গেছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের সংগ্রাম ক্ষেত্রে। প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর সৃজনধারা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। এই কারণেই বাংলায় অন্যান্য কবিয়াল ও গণশিল্পীর থেকে গুরুদাস পালকে নিঃসন্দেহে পৃথক ও উল্লেখ্য স্থানে বসানো যায়।

১৯৩৩ সালে চারণকবি মুকুন্দদাসের সাথে তাঁর পরিচয় ও হাতেখড়ি। মুকুন্দদাসের দেশাত্মবোধে তিনি উৎসাহিত হন। কিন্তু শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম ও তার পরিপক্কতা হয় কমিউনিস্ট নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরীর মারফৎ। নিত্যানন্দ চৌধুরীই তাঁকে নতুন জীবনদর্শনে দীক্ষা দেন, গান রচনা ও গাওয়াতে উৎসাহ দেন। সেই সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক, কৃষক ও নির্যাতিত জনমানুষের রণাঙ্গনে যোদ্ধার ভূমিকা নেন। ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন তিনি। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সংস্পর্শে আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ সংগঠনে তিনি যুক্ত থেকে সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশ করেন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগে তিনি 'সনাতন মণ্ডল' নাম গ্রহণ করে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে কবি-গান গেয়ে বেড়াতেন। ১৯৪৯ সালে তিনি কারারুদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে যান।

পার্টি আইনীকরণের পর তিনি আবার নবউদ্যোগে জনমানুষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 'কলকাতার খবর', 'জনযুদ্ধের কথা', ইত্যাদি গানগুলি

সারা বাংলাতে পরিচিতি লাভ করে। ক'লকাতার রেড-এড হসপিটালে থাকাকালীন রমেশ শীলের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। পরবর্তী সময় শেখ গোমহানী, লম্বোদর চক্রবর্তী ইত্যাদির সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেন। ঐ সময় কবিয়ালদের কাছ থেকে কবিগানের ফর্ম সম্পর্কে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন যদিও তাঁর কবিগান বা তরজায় একটি ভিন্ন স্বাদ ও চরিত্র ছিল,। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে, শ্রমিক-কৃষকের লড়াইয়ে, খাদ্যের দাবীতে, দুর্ভিক্ষ-বন্যার সাহায্যে, ছাত্র-যুবের আন্দোলনে—তিনি ছিলেন প্রথম সারির মানুষ।

গুরুদাস পাল শুধুমাত্র কবিয়াল ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমাজ-সচেতক জনমানুষের প্রিয়তম বন্ধু—নেতাও। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লোকশিল্প জগত পরিবর্তিত যুগের সংগ্রামী কবিগান থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল।

চিররঞ্জন দাস

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

চেক কবিতার আধুনিক প্রয়াসের এক গুচ্ছ অনুবাদের ভূমিকায় মোহনলাল লিখেছেন "...আজকের চেকোশ্লোভেকিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করছে নতুন এক মানবিক এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের জন্য যা মানুষের মধ্যে আরও উচ্চ মাত্রায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আত্ম-ব্যঞ্জনা এনে দেবে, আর দেবে শুধু আধুনিক জীবনযাত্রার যান্ত্রিকতার প্রতি নয় বরং সব রকম কৃত্রিম এবং প্রাণশূন্য শ্লোগানের প্রতি ঘৃণা, যে ধরণের শ্লোগান শূন্য-গর্ভ অর্থহীন বড় বড় কুয়াশার আড়ালে মহৎ আদর্শকে আড়াল করে রাখে।"

মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে লেখা কথাগুলি। যখন প্রগতির উপবীতধারীও নীরক্ত অ-ভাবুকদের মেলায় মুক্তকচ্ছ হয়ে নাচছেন তখন যথার্থ সংস্কৃতমনা ব্যক্তির অ-প্রগল্‌ভতায় তিনি তাঁর অনুবাদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন। যথার্থ পরিশীলিত ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাঙালীয়ানার প্রতিনিধিরূপেই চিহ্নিত হবেন মোহনলাল তাঁর অসাধারণ দুই সাহিত্যকর্ম—"অসমাপ্ত চটাক" এবং "দক্ষিণের বারান্দা"র জন্য।

বেশ কিছুদিন আগে মোহনলাল প্রকাশ করেছিলেন চীনা গল্পের অনুবাদ সংকলন..."চীনা মাটি"। তাঁর মাধ্যমেই বাংলা-ভাষায় উপস্থিত হয়েছিল

কার্ল ক্যাপক এবং অন্যান্য কয়েকজন চেক কথাশিল্পী—"নীলচন্দ্রমল্লিকা" গ্রন্থে। রেমার্কের "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট" তাঁর এক স্মরণীয় অনুবাদ গ্রন্থ।

পরিণতবুদ্ধির ভ্রমণকাহিনী হিসেবে তাঁর রচিত "লাফাযাত্রী", "চরণিক", "পুনর্দর্শনায় চ" স্মরণীয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কিশোরদের জন্য "সোনার ঝরণা"। কিশোরদের জন্য তাঁর অন্যান্য "বোর্ডিং স্কুল", "বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার" প্রভৃতি।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র এবং অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্ররূপে মোহনলালের জন্ম। বিদ্যার্জন করেন হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে, পরবর্তীকালে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সে। বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন তিনি। গত ১৪ই জানুয়ারী তিনি এক পুত্র, এক কন্যা এবং পত্নী চেক-দুহিতা মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়কে রেখে পরলোক গমন করলেন।

এই মুহূর্তে যখন সাংস্কৃতিক আভিজাত্য, সুস্থযুক্তি, মুক্তবুদ্ধি ও বিকারমুক্ত রসচেতনার শ্বাসরোধের অপচেষ্টায় মেতেছে কিছু লোক তখন এই দুঃসংবাদ দুঃখবহ।

মৃণাল চৌধুরী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ষাট বৎসরে পদার্পণের দিনে সঞ্জয় ভট্টাচার্য মারা গেলেন। কবি, ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক, প্রবন্ধকার ও সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে সাহিত্য সেবক হিসেবে আমরা মর্মাহত। বাঙালী চরিত্রের স্বাভাবিক বাগ্‌বাহুল্য হেতু উচ্ছ্বসিত অতিকথন এসময় রীতি, এবং সে রীতি যথারীতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমরা তা করব না, কেননা আমরা মনে করি কবিব্যক্তির মৃত্যু যতই শোকাবহ ঘটনা হোক শোকের প্রাবল্যে মৃতের মূল্যায়ন ভুল হওয়া উচিত নয়। তাতে সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের ক্ষতি হয়ে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে একথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর একটি বহুবর্ণ বিচিত্র ভূমিকা রয়েছে। তাঁর মনস্বিতার কারণে তিনি জনপ্রিয় লেখক হতে পারেন নি।

আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর আসনটি সুচিহ্নিত, কবিতাতেই তিনি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছেন। একাধিক উজ্জ্বল মানবতাবোধে সম্পৃক্ত ছোট গল্পের তিনি জনক। উপন্যাস ও প্রবন্ধে তিনি নিজের সুনিশ্চিত মননশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

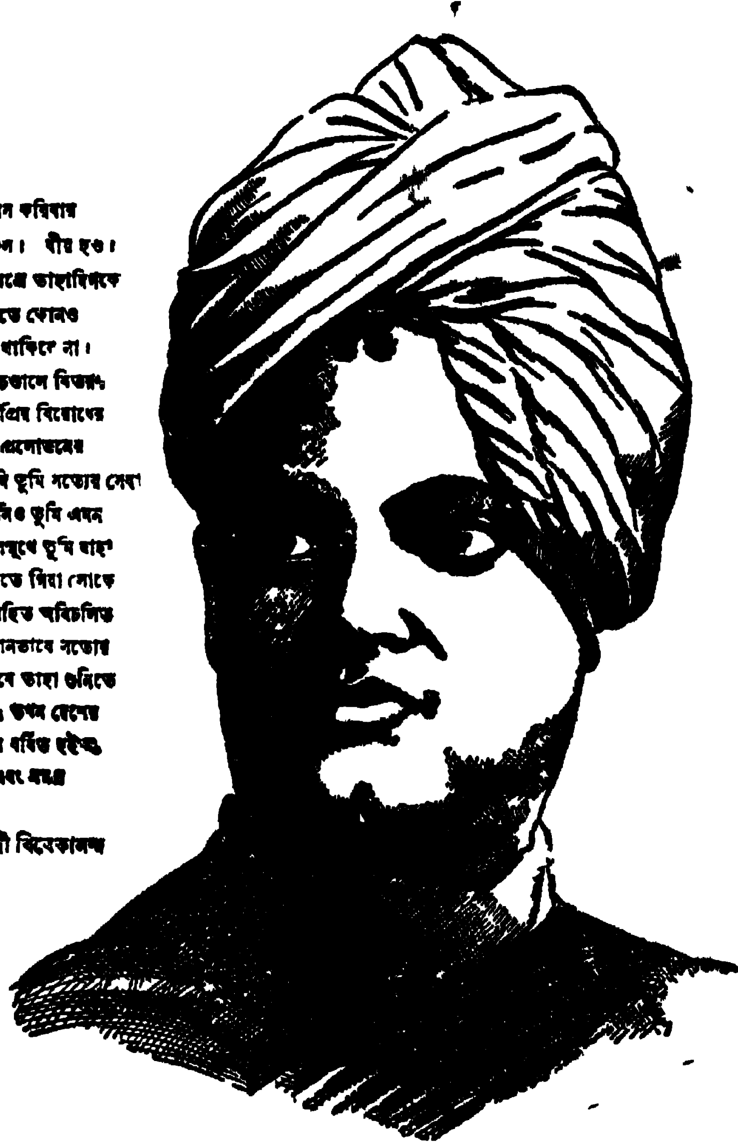
সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভূমিকাটিই আমাদের কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা দেশে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য বুঝেছিলেন বৃহৎ পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক স্বার্থবোধ এমন ওতপ্রোত জড়িত যে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণবান ধারাটিকে বহন করতে হবে লিটল্ ম্যাগাজিনগুলিকেই। এই উপলব্ধি থেকেই 'পূর্বাশা'কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছেন তিনি। একটি দীপ্ত উদার মন নিয়ে তিনি নতুন লেখকদের আহ্বান জানিয়েছেন, সম্ভাবনায় বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এ কালের প্রতিষ্ঠিত অপ্রতিষ্ঠিত অনেক লেখকই তাঁদের এই সর্বোত্তম সুহৃদকে ভুলতে পারবেন না। যে অবর্ণনীয় ক্লেশ স্বীকার করে এখনকার লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলি বাৎসরিক পত্রপত্রিকার রাহুগ্রাস থেকে সাহিত্য সাংস্কৃতির সুস্থতা পবিত্রতা রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছেন তা কিয়দংশে 'পূর্বাশা'র অগ্রাধিকার এমন কথা বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

এই সংগ্রামী চেতনার জন্য আমরা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে ঋণী। কিন্তু অদম্য অধ্যবসায় ও অসাধারণ বৈদগ্ধ্যকে তিনি শ্রেয়োচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন কি? তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত লেখক কবিদের অনেকেরই আজ বৃহত্তম মঙ্গল সাধনার বিপরীত কোটিতে অবস্থান দেখে সন্দেহ জাগে। এই বিচারে যদি সঞ্জয় ভট্টাচার্য ব্যর্থ সাব্যস্ত হন তবু তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

ব্যক্তি হিসেবে সঞ্জয় ভট্টাচার্য দুর্লভ সততা ও দরদী মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মননের নঞর্থক দিকটা বিশ্বাসসঞ্জাত, আজকের বহু বুদ্ধিজীবীর মত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। তাই তাঁকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দুইই আকর্ষণ করেন।

তাঁর গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশাধিক। তাঁর শেষতম গ্রন্থটি প্রকাশের অপেক্ষায়।

নিরঞ্জন শীল



সত্য ও লোকাচারের মধ্যে আপস করিবার ভাব স্পষ্টই কোন কাপুরুষতার ফল। বীর হও। যাহারা আমার উত্তরসাধক, সর্বাগ্রে তাহাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। কোনমতে কোনও কারণে লেশমাত্র আপসের ভাব থাকিবে না। পরম শ্রেষ্ঠ সত্য সমগ্র দেশে আচণ্ডালে বিতরণ কর। সম্মানের হানি অথবা অপ্রিয় বিরোধের আশঙ্কায় ভীত হইও না। শত প্রলোভনের বিপরীত আকর্ষণ জয় করিয়া যদি তুমি সত্যের সেবা করিতে পার, তবে নিশ্চিত জানিও তুমি এমন এক দিব্যতেজঃপূর্ণ হইবে যে, সম্মুখে তুমি যাহা অসত্য জান তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া লোকে হটিয়া আসিবে। পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত হইয়া যদি তুমি চৌদ্দ বৎসর সমানভাবে সত্যের সেবা কর, তবে তুমি যাহা বলিবে তাহা শুনিতে ও বিশ্বাস করিতে লোকে বাধ্য। তখন দেশের অশিক্ষিত সাধারণের উপর মঙ্গল বর্ষিত হইবে, তাহাদের সর্ববন্ধন মুক্ত হইবে এবং সমগ্র দেশটি উন্নত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

॥ নবশক্তি প্রেস : স্বত্বাধিকারী : নবশক্তি নিউজপেপার্স কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১৪ ॥